নবীনচন্দ্র সেনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অলোক রায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২


Ranjan '08

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারায় মধু-হেম-নবীন এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য তিনটি নাম। কাছাকাছি সময়ে তাঁরা কাব্য রচনা করেছেন। মধুসূদনের কবিত্বশক্তির প্রশংসায় সকলেই উচ্চকণ্ঠ। একালে রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের সম্বন্ধে যে-কথা বলা হয় সেকালে মধুসূদন-সমসাময়িকদের সম্বন্ধেও সেকথা প্রযোজ্য—তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল মধুসূদনের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিল মধুসূদনের অনুকরণ। অবশ্য একটু অনুধাবন করলে বোঝা যায়, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র কবি-স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার কবি। নবীনচন্দ্র সেন নিজেকে কারও 'চেলা' বলে পরিচয় দিতে চাননি। মধুসূদনের কাব্য তাঁর পছন্দ হওয়ার কারণ নেই, সেখানে তিনি দেখেন শুধু গুরুগম্ভীর দাঁত-ভাঙা শব্দযোজনা, আর সেইজন্য রচনা করেন মধুসূদনের ভাষাভঙ্গির প্যারডি ·

ত্বিষাম্পতি মহেষ্বাশ সৌমিত্রী কেশরী,
দ্বিরদ রদ নির্মিত ইন্দুনিভাননা,
পরিবরতিলা, আর নমিলা গমিলা,
মেঘনাদ শবদে স্তবধে গৌড়জন।

অন্যদিকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনার কাল ধরা হলে, তাঁকে রবীন্দ্রযুগের কবিও বলা যেতে পারে। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের রচনাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি এঁদের রচনাকে 'নিরাকার কবিতা' বলতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়েছেন—'ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না/ও সে বয়ে গেল, কয়ে গেল না।' অর্থাৎ এঁদের 'ছায়াময়ী কবিতা ছুঁয়ে যায়, নুয়ে যায় না। বয়ে তো যায়ই, কিন্তু কিছুমাত্র কয়ে যায় না।' অন্যত্র তিনি কিছুটা তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'কবিতাদেবী এখন কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া সাকার, কাজে কাজেই পৌত্তলিক ও অশ্লীল। ছায়া নিরাকার। কিন্তু আমরা মূর্খ পৌত্তলিকেরা নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন বুঝিতে পারি না, তেমন এই নিরাকার কবিতাও কিছু বুঝি না।' নবীনচন্দ্রের কাছে কবিতার একটা সরল ও সহজ অর্থও থাকা চাই। মধুসূদনের কবিতা ভাষার জন্য জটিল ও কঠিন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাবের জন্য অশরীরী ও দুর্বোধ্য।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য নানা কারণে নগরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র সকলেরই জীবনের প্রধান অংশ কেটেছে কলকাতা শহরে। নবীনচন্দ্র এদিক থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন। তাঁর শৈশব কেটেছে চট্টগ্রামে, সেখানে 'বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার

পাদস্থিত নির্ঝরকণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধুগর্ভের তরঙ্গ-ভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদ-নদী-স্রোতে রজতধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধুমুখে ছুটিতেছে।' নবীনচন্দ্রের কবিতায় সেই নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণনা সহজ সুন্দর ভাষায় বারবার ফিরে এসেছে :

নিবিড় কানন; নেত্র যে দিকে ফিরাই,—
অনন্ত পাদপ-শ্রেণী, লতাগুল্মবন।
অভ্রভেদী-গিরি-শিরে,
কিবা নীল নদীতীরে
জলে, স্থলে কি গহ্বরে—নিবিড় কানন।

তারপর তাঁর কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বল শহরে। তবে উনিশ শতকের অন্যান্য কবির মতো তিনিও কলকাতার কলেজে পড়াশোনা করেছেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছেন। হয়তো গ্রাম এবং নগর, মুক্তপ্রকৃতি ও নাগরিক সমাজ, পুরনো সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য—এই নিয়ে নবীনচন্দ্রের মনে একটা দ্বিধা ছিল। ইংরেজি কবিতার অনুবাদ-অনুকরণে তিনি আগ্রহী, কিন্তু কবিগান-শ্যামাসংগীতের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ। নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর চিরকাল একটা বিতৃষ্ণা ছিল— 'স্বভাব কবিত্বে'র প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তিনি নিজের কবি-স্বভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'পাখির যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে, মাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।" শৈশবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন—'তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।' খণ্ড কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শানুসরণ করেছেন, "আমি 'প্রভাকরে'র অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।" পরিণত বয়সেও তিনি মিশ্রবৃত্ত পয়ারে প্রচলিত ধারার কবিতা লিখেছেন :

মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল।
মধুর তরল হাসি সতত তথায়,
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায়।

নবীনচন্দ্র যখন কলেজে পড়েন তখন হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' তাঁদের পড়তে হত, হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলির প্রভাবও তাঁর রচনায় দেখা যায়। ব্রাহ্ম 'ভ্রাতা-ভগিনী'কে নিয়ে লেখা যে-কবিতার কথা তিনি 'আমার জীবন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তা থেকে নবীনচন্দ্রের কবিজীবনের প্রস্তুতিপর্বের পরিচয় পেতে পারি,

ছিঁড়িয়াছে আশালতা, মৃণালের সূত্র যথা
ছিঁড়ে মত্ত করি পদদলনে।

সংসারের সুখ যত, সকলই হয়েছে গত,
কি কাজ আর দুঃখ-ভার জীবনে।

মধুসূদন নাকি এই কবিতা পড়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন, এবং নবীনচন্দ্রকে নিজের 'চেলা' বলে সাব্যস্ত করেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের দাবি ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে সত্য না হলেও তাঁর কাব্য বোঝার পক্ষে সহায়ক, 'প্রথমতঃ আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার (১৮৬৭) পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। ...'অবকাশরঞ্জিনী' বোধহয়, বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য। দ্বিতীয়তঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশ-প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে, কি কবিতায় ছিল না।' খণ্ড কবিতা ও স্বদেশ প্রেমের কবিতা রচনার জন্য নবীনচন্দ্র একসময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই দুই ক্ষেত্রে সেকালে নবীনচন্দ্রের খ্যাতির প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন হেমচন্দ্র। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' গ্রন্থে একাধিক স্থানে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। তিনি যদিও বলেন, 'আমি তো কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি নাই। আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয়।' কিন্তু অবস্থাচক্রে তাঁকে হেমচন্দ্রের প্রতিযোগী হতে হয়েছে। হয়তো সেকালের সমালোচকেরা দুই কবির মধ্যে নিত্য তুলনার মধ্য দিয়ে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী-সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। 'অবকাশরঞ্জিনী' সমালোচনার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য · 'নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙক্তির ন্যায় রচনা পাঠ করিয়া হেমবাবুকে স্মরণ হয়।' 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে চিঠিতে লেখেন, 'It is unfortunate Hem should have made his debut before you'. নবীনচন্দ্র অবশ্য মনে করতেন, তাঁর কাব্যাদর্শ হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি কখনও বলেন, 'বৃত্রাসুর মরিল কি বাঁচিল, আমাদের তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার মতে এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া, তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া যদি তাঁহার শক্তি সঞ্চালন করিয়া কাব্য লেখেন, তবে লোকের হৃদয় অধিক স্পর্শ করিবে।' যদিও পরে নবীনচন্দ্র নিজে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনেই ত্রয়ী কাব্য রচনা করলেন। আবার কখনও লেখেন, যুবরাজের ভারতদর্শন 'উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান পাতিবার জো নাই। কিন্তু আমি এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। এবারও লিখিলাম না।' কিন্তু অনতিপরে বিলেতে ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে যুবরাজ-প্রশস্তি 'ভারত-উচ্ছ্বাস' লিখলেন। নবীনচন্দ্রের মতে, হেমচন্দ্রের 'কলিকাতাবাসী হওয়া তাঁহার একটা দুর্ভাগ্যের কথা হইয়াছে। কলিকাতায় যাহা একটা হুজুগ উঠে, তিনি তাহাই লেখেন। তাহাতে তাঁহার শক্তির অপচয় হয়।' কিন্তু নবীনচন্দ্রও 'হুজুগে কবিতা' অর্থাৎ উপলক্ষ প্রধান কবিতা কম লেখেননি। শুধু 'ভারত-উচ্ছ্বাস' নয়, 'ডিউক অফ এডিনবার প্রতি', কনভোকেসন দর্শনান্তর 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য', 'বুড়ামঙ্গল মেলা', 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণ' -প্রভৃতি বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি কবিতা লিখেছেন। 'পিতৃবিয়োগ',

'মুমূর্ষু শয্যায় বাঙালি যুবক' -ইত্যাদি কবিতাও বিশেষ ঘটনার স্মৃতিবাহী। আসলে সে কালে যাকে খণ্ড কবিতা বলা হত, তা ছিল একান্তভাবে বিষয় বা কাহিনীনির্ভর—এক্ষেত্রে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আসলে নবীনচন্দ্রের কাব্যধারা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণার সূত্রপাত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' সমালোচনা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ব্যাপক অর্থে সে সময়ে বলেছিলেন, 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস -প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।' 'পলাশির যুদ্ধ' সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।' কিন্তু মনে হয় গীতিকাব্য নবীনচন্দ্রের স্বক্ষেত্র ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবিতাগুলি সম্বন্ধে সংগত কারণে মন্তব্য করেন, 'This lyric craje, this *'sturm and drang'*, was, however, more a play of the fancy than of the imagination, more artificial than artistic.' নবীনচন্দ্রের রচনায় গীতিময়তা থাকতে পারে, উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রাচুর্য সম্ভব, কিন্তু তাঁর মতো 'স্পষ্ট কাব্যে'র ভক্তের পক্ষে গীতিকবিতার ভাবব্যঞ্জনা বা বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতির প্রকাশ কাম্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি তাঁর ভালো লাগেনি, কারণ কবিতাটি কিছুই বুঝতে পারেননি। আসলে তিনি সবকিছু বুঝতে চান ও বোঝাতে চান। অন্যদিকে পরিণত বয়সে তিনি বলেছেন, খণ্ড কবিতা লিখতে আর ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, 'তিনি নিঃসন্দেহে বঙ্গের সর্বপ্রধান গীতি কবি। শুনিয়াছি, তাঁহার বিশ্বাস, বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।' রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সত্য হোক বা না হোক, নবীনচন্দ্রের আশঙ্কা নবীনচন্দ্রের কাব্যাদর্শের পরিচয় দেয়।

নবীনচন্দ্র সে কালের প্রথানুযায়ী মহাকাব্য লিখতে চান। এমনকি 'পলাশির যুদ্ধ'কেও তিনি মহাকাব্য বিবেচনা করতেন। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' সেকালে অনেকের কাছে মহাকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে হয়েছে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মহাকাব্য ছিল সেকালে বাংলা মহাকাব্যের আদর্শ। কিন্তু মহাকাব্যের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে তার চরিত্র-পরিকল্পনা, ভাবপ্রেরণা ও প্রকাশশৈলী সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। প্রথম দিকে একদা রোমান্টিক আখ্যান-কাব্য তাঁর প্রিয় ছিল, তাঁকে 'বাংলার বায়রন' বলা হলে তিনি খুশি হতেন। 'রঙ্গমতী' কাব্যকে 'মেট্রিকাল রোমান্স' আখ্যা দেওয়া হলে তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ ও নীতিতত্ত্ব-অভিমুখিতা তাঁকে ক্রমশ সৌন্দর্য কল্পনার জগৎ থেকে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের পথে চালিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, তার মধ্যে 'ইংরেজি পীরিতের ছায়া' বড় বেশি, তার মধ্যে 'দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভগ্নীপ্রেম—যাহা রামায়ণ-মহাভারতের

শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ' তা নেই। আজকের দিনে এ অভিযোগ আমাদের কাছে কৌতুককর মনে হতে পারে, কিন্তু সে কালে 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'—বঙ্কিমচন্দ্রের এমন উক্তি নবীনচন্দ্র প্রমুখ অনেকের ভালো লাগেনি। নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুধর্মের একটা 'দার্শনিক ইতিহাস' লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে লিখলেন, 'এরূপ কাব্যের জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই।' তখন তাঁর মনে হল, এ কাজ তাঁকেই করতে হবে, তাঁর 'হৃদয়ে কি এক মহাভাব, মহাআকাঙ্ক্ষা ও মহাআবেগ সঞ্চারিত' হল, যার ফলে তিনি লিখলেন 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'। তিনি কৃষ্ণ ও বুদ্ধের অমানুষিক লীলাকাহিনী লেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। 'খ্রিষ্ট', 'অমৃতাভ', 'অমিতাভ' এই দার্শনিক ইতিহাসের পরিশিষ্ট ভাগ। নবীনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি অবতারবাদ। গীতার অবতারতত্ত্বের সঙ্গে বাইবেলের (ম্যাথু, ২৪) অবতারতত্ত্বের সাদৃশ্য খুঁজে পান তিনি—'কৃষ্ণোক্তি ও খ্রিষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই। ...কৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রিষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলই আর্যধর্মাবলম্বীদের কাছে অবতার-স্বরূপ পূজনীয়।' বুদ্ধদেব যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার মধ্যেও নবীনচন্দ্র কৃষ্ণোক্তি সন্ধান করেছেন। 'প্রচলিত হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট। ..বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্মের বহুশাখার একটি শাখা বিশেষ।' তত্ত্বদর্শন হিসেবে এসব কথা মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হিসেবে অকিঞ্চিৎকর :

পাইয়াছি সর্বশক্তি আমি, শিষ্যগণ!
পিতা, পুত্র, পরমাত্মা নামেতে দীক্ষিত
করিয়া মানবজাতি, কর প্রচারিত,
মম শিক্ষা ; যতদিন রবে চরাচর,
তোমাদের সঙ্গে আমি রব নিরন্তর। (খ্রিষ্ট)

পূর্ণ মম জন্ম-চক্র, কর্ম-চক্র আর,
এত জন্মে, এত যুগে। আবর্তিত আর
জন্ম-জরা-মৃত্যু-চক্রে হইব না ঘোর
দুঃখপূর্ণ; উপস্থিত নির্বাণ আমার। (অমিতাভ)

নবীনচন্দ্রের কবিতায় একদিকে যেমন আছে তত্ত্বভাবনার আতিশয্য (ঈশ্বর গুপ্তের নৈতিক ও পরমার্থিক কবিতার কথা মনে পড়বে), অন্যদিকে তেমন আছে, আত্মবিস্মৃত ভাবাতিশয্য। এ দুয়ের সমন্বয়-সাধন তিনি করতে সক্ষম হননি। তিনি ত্রয়ী কাব্যরচনার পিছনে দৈবীপ্রেরণা অনুভব করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের বিশ্বাস এ কাব্য তিনি লেখেননি, কোনো এক 'অজ্ঞাত আবেগে ইচ্ছাধীন পুতুলের মতো চালিত' হয়ে এই কাব্যগুলি লেখা হয়। রোমান্টিক কাব্যেও দৈবীপ্রেরণার কথা শোনা যায়। রোমান্টিক কবিরা প্রেরণার মধ্যে আবেগের স্পন্দন অনুভব করেছেন সত্য, কিন্তু আত্মবিস্মৃত মত্ততার আবেশ কাম্য বিবেচনা করেননি। 'প্রেরণা' শব্দের আদি অর্থ ছিল প্রত্যাদেশ বা ভাবাবেশ। নবীনচন্দ্র 'প্রেরণা'র এই আদিম রূপটি শুধু

অনুভব করেননি, তিনি এর সঙ্গে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে যুক্ত করেছেন। ফলে 'রঙ্গমতী'র মতো রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লেখার সময়েও তাঁর কপোল বেয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বর্ষিত হয়,—প্রাণে উচ্ছ্বাস এবং নয়নে অশ্রু ছাড়া তিনি কাব্যই লিখতে পারেন না। এরফলে তাঁর রচনায় প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়, যা উনিশ শতকে ছদ্মধ্রুপদী মহাকাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না :

দেখি সুলোচনা জানু পাতি বসি
কহে, করি যোড় যুগল পানি,—
'দুই রূপে প্রভু চাহি দুই বর,
নিজ রূপে—সেই বনের সুখ।
প্রতিনিধিরূপে চাহি সুভদ্রার'—
সুভদ্রা চাপিয়া রাখিলা মুখ। (রৈবতক)

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' রচনাকালে 'প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বহিয়া অশ্রুধারা বহিত।' তিনি 'আমার জীবন' গ্রন্থে সবিস্তারে তাঁর কাব্যরচনার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন—"কখন বা সমস্ত প্রাতঃকাল এরূপে অশ্রু-বিসর্জন করিতাম। 'কুরুক্ষেত্রে'র শেষ কয়েক সর্গ লিখিতে আমি অনর্গল কাঁদিয়াছি। কখনও এরূপ কান্না পাইত যে, কাগজ ভিজিয়া যাইত, লিখিতে পারিতাম না। 'প্রভাসে'র 'বীণাপূর্ণতান' সর্গ লিখিয়া যেখানে জগৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত ভক্তসেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ-হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; আমার চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। কাগজ ভিজিয়া যাইতেছে, অক্ষর ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সেই কাগজ ফেলিয়া দিয়া স্নানকক্ষে গিয়া বারবার চক্ষু প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বারবার লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, বারবার লেখা অশ্রুজলে ধুইয়া যাইতেছে। ...এইভাবে বিহ্বল অবস্থায় 'প্রভাস' শেষ করিলাম।" নবীনচন্দ্রের সব লেখাই কমবেশি পরিমাণে বিহ্বল অবস্থায় লেখা।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য 'এজ অফ রীজন' নামে চিহ্নিত হয়েছে। যুক্তিবাদের প্রসার বাংলা গদ্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির কারণ। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, এমনকি মধুসূদনের কাব্যেও আত্মসচেতনার ভাব প্রবল। এই প্রবল আত্মসচেতনা আমাদের নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ। নবীনচন্দ্র এদিক থেকে উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারায় ব্যতিক্রমী কবিব্যক্তিত্বের নিদর্শন। তাঁর ভাবাবিষ্ট কবিমন, আত্মবিস্মৃতি, কখনও অসংযম, মহাকাব্য-রচনার অনুকূল না হলেও, স্বতোৎসারিত বিষয়মুখী কবিতা-রচনায় সক্ষম, তার প্রমাণ এই নির্বাচিত কবিতা-সংকলন।

১ জানুয়ারি ২০০২ — অলোক রায়

সূ চি প ত্র

রঙ্গমতী (১৮৮০)

রৈবতক (১৮৮৭)

কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩)

প্রভাস (১৮৯৬)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবিতা :

আকাঙ্ক্ষা

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসম-যৌবনে,
ফুটিয়াছে যেই ফুল সাধ ছিল মনে,
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন,—
দেখিয়াছি, কিন্তু আশা হল না পূরণ।
নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ,
সৃজিলেন তব সেই চারু চন্দ্রানন;
নয়ন ভরিয়া যত করি নিরীক্ষণ,
ইচ্ছা হয় আর-বার করি দরশন।
কিন্তু মিছে আশা হায়! সরলে তোমার,
দেখিব কি প্রেমফুল্ল বদন আবার?
আবার কি আশামত্ত নয়ন-যুগল,
নিরখিবে প্রিয়ে! তব নেত্রনীলোৎপল?
অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
স্মিতবিকশিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ,
প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর,
মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার?
বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
নিবিবে কি দুঃখানল, জুড়াবে জীবন?
এইরূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন,
ফুটিবে নিশীথে হবে দিবসে নিধন।
যে সকল সুখ আহা! কপালে আমার,
ফলিবে না এই জন্মে; তবে কেন আর,
চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রুজলে,
মরিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে?
কেন স্মৃতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে,
চিত্র করি তারে, যারে দেখে আচম্বিতে

ভুলিয়াছ এতদিনে; বলো না কেমন,
তুমি কি লো অভাগারে ভুলোনি এখন?
মম দীন-হীন মূর্তি ভাসে কি লো আর
তব চিত্ত-সরোবরে, বলো একবার?
সুখের সাগরে প্রিয়ে! ডুবিয়া কখন
দেখ কিহে বিদেশীয় বন্ধু একজন!
দেখ কিনা দেখ, কিন্তু আমি অনিবার,
নিরখি সরলে! তব মোহিনী আকার।
সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সাঁতার।
কোমল কাঞ্চনকান্তি, রূপের কিরণ,
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর-যুগল,
সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল।
মধুর তরল হাসি সতত তথায়
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলির-প্রায়।
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়,
প্রেমভরে কত কথা কহিছ আমায়।
দুলিছে সৌন্দর্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার গায়।
কিন্তু আহা! সে সকল করিয়া স্মরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন?
একদিন তরে মাত্র দেখিয়াছি যারে,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে,
শুনাইয়া অভাগার মনের বেদন?
সে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন?
যাই প্রিয়ে! যতদিন থাকিবে জীবন,
প্রণয়-কমলাসনে করিয়া স্থাপন,
রাখিব তোমারে সখি! হৃদয়ে আমার,—
দুঃখী আমি, আর কিবা দিব পুরস্কার?
প্রেম-বিকশিত নেত্রে দেখেছ যখন,
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ।
মন-প্রাণ অভাগার করিয়া হরণ
সুখে থাকো বিধুমুখি! বিদায় এখন।
তুলিয়া কমলমুখ দেখ, একবার,
মনে রেখো দুঃখী বলে বিদায় আবার!

হতাশ

১

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন?
দুর্বল মানসতরী, ছিল আশা-ভয় করি,
চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন?
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায়।

২

কেন কাঁদে মন আহা! কে দিবে বলিয়া?
কে জানে এ অভাগার মনের বেদন?
অন্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,
যে অনলে এ হৃদয় কবিছে দাহন,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া?

৩

কেন কাঁদে মন আহা! ভাবি মনে-মনে,
অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,
চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতা-প্রায়,
দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে বাঁচিব কেমনে?

৪

অমানিশা-কালে যথা শোভে নীলাম্বর
খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়
তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার,
শোভিত শতেক আশা নক্ষত্রের-প্রায় ;
আজি দেখি সকলেই হয়েছে অন্তর।

৫

বিষাদ-জলদ-রাশি, আসি আচম্বিতে,
ঢাকিয়াছে আশা যত, দেখা নাহি যায়,
দরিদ্রতা ভয়ংকর, পিতৃশোক তদুপর,
কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল-প্রায়
তারা সাজাইবে চিতা জীয়ন্তে দহিতে?

সায়ং চিন্তা

১

সুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে,
ভ্রমিতে-ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে স্রোত-সম্ভূত অনিলে,
কার্য-ক্লান্ত কলেবর, সন্তাপিত মন।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী
ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত-প্রায়, সুবর্ণে অঙ্গিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে-স্থানে রক্ত-কাদম্বিনী।

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে;
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাঁপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ-সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুম্বিয়া তটিনী।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয়;
সুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে,
গাইছে রাখালশিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা নাহি ভবিষ্যৎ-ভয়।

৫

নাহি জানে অভাগার অবস্থা কেমন!
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষণ্ণ-অন্তর;
কেবা রাজা, প্রজা কেবা, নাহি জানে রাজসেবা
নাহি জানে অধীনতা কেমন নিগড়,
স্বাধীনতা কি রতন, ভাবে না কখন।

৬

স্বদেশের রাজনীতি, শাসন-প্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি,
কেমনে ভাবতে পশি, দাসত্বে করিল মসি
আর্য-সুত-বীর্য-ভানু, পতঙ্গ যেমতি
ভস্মিল যবল-লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি।

৭

শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল,
বিধবা কুটুম্ব যারা, তাহাদের অশ্রুধারা
নিরখিয়া কাঁদে বাছা প্রণয়বৎসল;
কিসে দুঃখ দূর হবে চিন্তে না বিধান।

৮

কেবা কৃষ্ণ, কেবা খ্রিস্ট, কেবা রামমোহন
ধর্ম কার, কি প্রকাব, কেন মতান্তর,
কিছুই না ভাবে মনে, পুলকিত দরশনে
অপূর্ব জগতশোভা অতীব সুন্দর,
তথাপি অবোধ শিশু ধর্মের জীবন।

৯

নাহি চাহে ধর্মনীতি ; কখন না যায়
কেশবের সংকীর্তনে, দেবেন্দ্রসমাজে,
করি নেত্র নিমীলন, করি অশ্রু বরিষণ
ডাকে না "দয়াল প্রভু" ; কিংবা দিব্য সাজে
তুলিয়া ধর্মের ধ্বজা পথে না বেড়ায়।

১০

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল-হৃদয়
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায়;
লতা-পাতা জড়ো করি, কভু ভাঙি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে-হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশবকাল সুখের সময়।

১১

চিন্তা কাল-ভুজঙ্গিনী করে না দংশন;
নিরাশ-প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন;

দুরাকাঙক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে; আহা! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন।

১২

হাস হাস হাস শিশু। নহে দিন দূর,
সংসার-সাগরপারে, বসিয়ে যখন
বিষাদ-তরঙ্গমালা, গনিতে-গনিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ; জানিবে তখন,
নির্মল শৈশবক্রীড়া সুখের স্বপন।

১৩

আমিও ইহার মতো ছিলাম নির্মল
ছিলাম পরম সুখে সুপ্রসন্ন মনে,
আমার জীবন-কলি, (দিতে সুখে জলাঞ্জলি)
কে ফুটালো, পোড়াইতে ভীম হুতাশনে?
কে সুখ-সাগরে মম, মিশালো গরল?

১৪

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হল বিকশিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙিল মম শৈশব-স্বপন।

১৫

পিঞ্জরে আবদ্ধ যেই বিহঙ্গশাবক,
যে বিধি ফুটায় তার যুগল-নয়ন,
সে বিধি পাষাণ-মনে, ভারত-সন্তানগণে
দিলেন জ্ঞানের নেত্র, দেখাতে কেমন
দাসত্ব-শৃঙ্খলভার, অবস্থা-নরক।

১৬

না জানি কি মন্ত্রে বিদ্যা করিল দীক্ষিত,
যত পড়ি ততো বাড়ে মনের বিষাদ;
ততোই অসুখ মনে, বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে
কেন পড়িলাম আহা! একি পরমাদ!
ভাগ্যগুণে সকলি কি ঘটে বিপরীত?

১৭

ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম; আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়; আর্যবংশ-কীর্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

১৮

বলো মা ভারতভূমি বলো মা আমায়,
কোথায় তোমার সেই বীর পুত্রগণ?
যাহাদের কীর্তিবলে, তব নাম ধরাতলে,
পূজ্যতম ছিল যেন অমরভবন,
সে সকল পুত্র তব বল না কোথায়?

১৯

তাঁদের সন্তান কিগো আমরা সকল!
আমরা দুর্বল ক্ষীণ পাপিষ্ঠ-হৃদয়!
জননি ভারত-ভূমি, বীর-প্রসবিনী তুমি,
কেমনে পুষিলে হেন ক্ষীণ জীবচয়,
শুকের কোটরে যত শালিকের দল?

২০

কোথায় তোমার সব দুর্লভ ভূষণ,
মুকুতা, প্রবাল, হীরা, সুবর্ণভাণ্ডার?
কোথায় সে কোহিনুর, কোথায় দরিয়ানুর,
কোথায় প্রাচীরমালা, আলোক-আগার,
রত্ন-শিখি-রাজাসন কোথায় এখন?

২১

কোথায় এসব-সোহাগের ধন?
হরিয়াছে জেতৃগণ সকল সম্বল।
কেবল না পারে কাটি, হরিতে উর্বরা মাটি,
আছে স্বর্ণ-প্রসূ ভূমি, আছে হিমাচল,
তাই মানচিত্রে নাম রয়েছে এখন।

২২

সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্নসিংহাসনে,
বিরাজিত বীরদর্পে তব পুত্রগণ,

আমরা অভাগাগণ, হারাইয়া সিংহাসন,
কারাইয়া নৈসর্গিক স্বাধীনতা-ধন,
কাঁদিতেছি অনিবার বিদেশি-চরণে।

২৩

কাঁদে হিমাচল যদি কুমারী সহিত,
রোদনধ্বনিতে যদি বিদারি গগন,
অতিক্রমি পারাবার, আমাদের হাহাকার
প্রতিধ্বনি করিবে না ইংলন্ডে কখন,
অরণ্য-রোদন তাহা হইবে নিশ্চিত।

২৪

রে বিধাতঃ!
কি দোষে ভারতভূমি দোষী ও-চরণে?
কেন অভাগিনী সহে এতেক যন্ত্রণা,
ভারত-নিশ্বাসে ভার, দিয়ি যাও সিন্ধুপার,
রানী যিনি, কহ তাঁরে এ সব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত-রোদনে।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস

সখি রে!
কি আর বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে।
দিন-দিন, পল-পল, জ্বলিছে বিরহানল
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয়সখি, মরিতেছি মরমে।

২

সখি রে!
ওই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে,
নাচিতেছে অনুরাগে সমীরণ-চুম্বনে;
বিহঙ্গিনী ফুল্ল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ-সনে,
বরষি সংগীতসুধা মোহিতেছে শ্রবণে;—
ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে।

সখি রে!

যেদিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে,
যেইদিকে কান পাতি শুনি তারে শ্রবণে;
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি মিশাইয়া জীবনে,—
প্রিয় সখি, মিশাইয়া জীবনে।

৪

সখি রে!

তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে;
তবে কেন দিবা-নিশি ভাসি দুঃখ-সাগরে?
ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে,
উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্জরে?
ওলো সখি, জেনেছি তা অন্তরে।

৫

সখি রে!

গেলে এ বসন্তকাল আবার সে আসিবে,
নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্বার গাইবে;
ফুটিবে কুসুমগণ, বহিবে এ সমীরণ;
কিন্তু সেই পাখি পুনঃ পিঞ্জরে না ফিরিবে,
প্রেম-পাখি পিঞ্জরে না বসিবে।

৬

সখি রে!

শুকাইবে এই ফুল; কিন্তু পুনঃ দেখিবে,
এ ফুল ফুটিয়া পুনঃ সুসৌরভে ভরিবে।
এ হৃদয়ে পুনর্বার, সেই প্রেম-সুধাসার
এই জন্মে প্রিয়সখি আর নাহি বহিবে,
এই জন্মে আর নাহি ফিরিবে।

৭

সখি রে!

কিন্তু সেই প্রেমধারা যেইখানে বহেছে,
গভীর বিচ্ছেদরেখা সেইখানে রহেছে।
এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল,
নদী-সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে,
সখি রে, যথা নদী বহেছে।

৮

সখি রে!

জীবন যাইবে, এ যৌবন তো যেতেছে
ভস্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে।
ক্রমে-ক্রমে এইসব, হবে স্বপ্ন অনুভব,
দেখিতে-দেখিতে সখি অলক্ষিত হতেছে;—
প্রিয়সখি, সকলই যেতেছে।

৯

সখি রে!

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ তো যায় না।
প্রেম-সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না।
জীয়ন্তে তো না ছাড়িবে, প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ তো যায় না,
প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না।

১০

সখি রে!

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না সৃজিল?
লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশান?
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল?
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল?

১১

সখি রে!

কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা।
ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা!
নিরখি কুসুমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন,
স্মৃতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদনা,—
ফুলবাণ কবিদের কল্পনা।

১২

সখি রে!

দিবানিশি তারি স্মৃতি হৃদয়েতে জাগিয়ে;
অবলার মনোদুখ অনিবার বাড়িছে।
যত চাহি ভুলিবারে, ততো মনে পড়ে তারে
ততোই বিচ্ছেদানল বেগে জ্বলে উঠিছে,
প্রিয়সখি, অবলারে দহিছে।

বুড়া-মঙ্গল

১

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো ইয়ার,
ঢাল গো আবার, ঢাল পুনর্বার,
দিব আজি সুখ-সাগরে সাঁতার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল গো আবার।

২

লও গ্লাস করে লও সমুদয়।
"বিজয়নগর-অধিপতি-জয়,"—
গাও এক স্বরে; গাও বন্ধুচয়,—
"জয়-জয় কাশীনরেশের জয়"।

৩

হাসে বারাণসী, নাচে ভাগীরথী,
মলয়ামারুত দেয় প্রেমারতি,
বসন্তের রাজ্য, রানী আজি রতি,
বুড়া-মঙ্গলেতে সুরা ভাগীরথী।

৪

ঢাল ব্রান্ডি ঢাল, দূর করো সেরি,
লও গ্লাস করে নাহি সহে দেরি,—
বাহবা-বাহবা এই কি গো হেরি
অগ্নিময়ী আজি স্রোতকুলেশ্বরী!

৫

বুঝি যত মূর্খ ধেনোমাতাল,
জাহ্নবীর জলে দিয়াছে অনল;
হবে আমাদের জলের অকাল,
ঢাল ব্রান্ডি ঢাল, দ্রুত হস্তে ঢাল।

৬

কিবা শোভা আলো তরঙ্গে নাচিয়া,
প্রতিবিম্বে শত সহস্র হইয়া;
যেন একখণ্ড আকাশ খসিয়া,
বারাণসীঘাটে রয়েছে ভাসিয়া।

৭

শতেক তরণী একত্রে গ্রথিত,
ফরাসে, চেয়ারে, ঝাড়েতে ভূষিত,
আতরে-গোলাবে দিক্ আমোদিত,
বামাকণ্ঠস্বরে শ্রবণ মোহিত।

৮

উঠিল সংগীত-স্বর-লহরী,
এ পরান-মন লইল হরি,
উঠিলাম বেগে লম্ফ ত্যাগ করি,
"বিজয়নগর" তরণী উপরি।

৯

সুবর্ণ-মণ্ডিত কৌচ-আসনে,
"বিজয়নগর" স্বয়ং আসীন,
গৌরাঙ্গ গৌরবে সোনার বরনে,
কারুকার্য সব হয়েছে মলিন।
আশেপাশে গুটিকত ইংরাজ
মনের আনন্দে করিছে বিরাজ।

১০

উত্তরে যতেক গায়িকার দল,
পেশোয়াজ অঙ্গে করে ঝলমল,
গোলাপ-অপরাজিতা-বিম্বফল,
একাধারে যেন বিরাজে সকল।
দক্ষিণে তেমনি মোসাহেব-থানা
সাজায়ে রেখেছে চিড়িয়াখানা।

১১

সম্মুখে সৈরিন্ধ্রী, ভ্রাতা পঞ্চজন,
বসে অপমানে বিষণ্ণ বদন;
থেকে-থেকে ভীম করিছে গর্জন,
কাঁপিতেছে গঙ্গা, পৃথিবী, গগন।
হতেছে বিরাটপর্ব অভিনয়
নিতান্ত অসভ্য কিন্তু সমুদয়।

১২

ভীমের ভৎর্সনা শুনিয়া শ্রবণে
না জানি কি ভাব উথলিল মনে,
উড়িল মানস, স্থির নয়নে
চাহিয়া রহিনু শূন্য দরশনে;—
তটিনীতরণী, আলো রাশি-রাশি
ঘুরিতে লাগিল, পুরী-বারাণসী।

১৩

না জানি এভাবে ছিনু কতক্ষণ,
কাল-পরিমাণ নাহিকো স্মরণ।
একটি বাসনা বিদ্যুৎ-মতন,
উদয় হৃদয়ে হইল তখন।
ইচ্ছা হল বলি হাত দিয়া বুকে,
"বিজয়নগর" নৃপতি-সম্মুখে।

১৪

ছি-ছি মহারাজ, কি বলিব হায়!
খেদে এই বুক বিদরিয়া যায়,
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভা পায়,
এসব আমোদ বলো না আমায়?
ও পাষাণ-মুখে হাসিছ কেমনে?
সহিছো কেমনে ও পাষাণ-মনে?

১৫

শুন মহারাজ ভীমের গর্জন,—
"দিব প্রতিফল কীচকে, রাজন্!
মারিব পাপিষ্ঠে, বধিব জীবন,
এত অপমান, পাণ্ডুর নন্দন!
দাও অনুমতি, দাও মহারাজ,
জ্বলিছে হৃদয় নাহি সহে ব্যাজ"।

১৬

"দেখো পরাধীনা কৃষ্ণার বদন
অপমানে আহা! মলিন কেমন!
দেখো-দেখো তার সজল নয়ন
নিস্তেজ, নিরাভা, করুণ-দর্শন।

একে পরাধীনা তাহে অপমান,
কত সবে আহা অবলার প্রাণ"!

১৭

একে পরাধীন, তাহে অপমান,
কত সবে বলো আমাদের প্রাণ!
একে পরাধীনা, তাহে অপমান,
কত সবে আহা, ভারতের প্রাণ!
নাহি ভীমসেন, হতভাগিনীর
করিতে উদ্ধার, নাহি কোন বীর?

১৮

কি ছাই দেখিছ? কি ছাই হাসিছ!
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ?
একবারও কি মনেতে ভাবিছ
কাহাদের এই বীরত্ব দেখিছ?
ভারত এদের ছিল একদিন,
ভারত তখন আছিল স্বাধীন।

১৯

এদের সন্তান তুমি মহারাজ;
ইহাদের প্রজা ভারত-সমাজ;
আজি সে ভারতে যবনের রাজ,
মোসাহেব রূপ তুমি মহারাজ।
এই তুমি, ওই পঞ্চ সহোদর,
এ চিত্রে, ও চিত্রে, কতই অন্তর!

২০

এই বীরমূর্ত্তি ভীম দুর্ব্বিজয়,
এই কাপুরুষ রমণী-হৃদয়;
ও হৃদয় হয় পাঞ্চজন্যে লয়,
বামাকণ্ঠ-স্বরে এই মুগ্ধ হয়;
ওই করে শোভে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদল,
এই করে, মরি, ফর্‌সির নল!

২১

অপমানে ক্ষত শার্দ্দূলের-প্রায়,
তর্জ্জনে-গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়,

তোমরা বসিয়া যবন-ছায়ায়,
শত অপমান সহ পায়ে পায়।
সব ছেড়ে দিয়ে করেছ বিহিত
সম্মানের যুদ্ধ জুতার সহিত।

২২

চিরপরাধীনা ভারত দুঃখিনী
ঢালিতেছে আহা! দিবস-যামিনী,
শ্রবণে তোমার, দুঃখের কাহিনী,
কেমনে শুনিছ বলো নৃপমণি?
ভারতের আহা! এই হাহাকার
বারেক পশে না শ্রবণে তোমার?

২৩

কৃতঘ্ন আমরা হব না কখন,
কৃতজ্ঞতা এই ভারতজীবন;
মাগিব সতত ঈশ্বর-সদন,
অখণ্ড হউক ইংলন্ড-শাসন।
লুটাব পড়িয়া বিরাটের পায়,
কীচকাপমান সহা নাহি যায়।

২৪

ফেলো মুখনল, উঠ মহারাজ,
ত্যজে এ আয়াস, লও বীর-সাজ,
পশ গিয়া বেগে ইংলন্ড-সমাজ,
যথা মহারানী করেন বিরাজ।
করি জোড়পাণি মহারানী-কাছে,
বলো গিয়া সব যাহা আছে মনে।

২৫

বলো গিয়া তাঁরে—"ভারত ভাণ্ডার,
উত্তর গোগৃহ হলো ছারখার,
সঙ্গে দেও এক কুমার তোমার,
পলকে অরাতি করিব সংহার।
দেখাব এমন মোহিনী কৌশল,
মূর্ছা হবে "মেও" "টেম্পলে"র দল।

২৬

দুঃখে-কষ্টে গিয়া এই বারোমাস,
ঘুচিয়াছে এবে অজ্ঞাত নিবাস;
জ্ঞানের আলোকে, হৃদয়-আকাশ,
নাশিয়া অজ্ঞান করেছে প্রকাশ;
দেও অনুমতি শাসি নিজদেশ,
পারি কি না পারি দেখ সবিশেষ"।

২৭

ঝম্-ঝম্ করি ব্যান্ডে যেমন,
জয় "ভিকটোরিয়া" বাজিল তখন,
উল্লুক-আকৃতি ভল্লুক-নয়ন,
মোসাহেব-বেশী বিকটদর্শন,
জনৈক বাঙালি আসিল নিকট,
অপমানভয়ে দিলাম চম্পট।

২৮

হয়েছে তখন চন্দ্রের উদয়,
নিশিশেষে ধীরে বহিছে মলয়,
বামাকণ্ঠস্বর মধুরতাময়;
বহিতেছে গঙ্গা তানে হয়ে লয়।
শুনিতে উদাসীন প্রাণ।
কাশীর প্রসিদ্ধ "ময়না"র গান।

২৯

নাচিছে "ময়না" মদন-মোহিনী,
আলোকিয়া কাশী-নরেশ-তরণী;
ওই করপদ্ম বিকাশে এখনি,
এই পেশোয়াজে চারুচন্দ্রাননী
ঢাকিছে বদন, আবার এখন
বিকাশিছে দেব-দুর্লভ-দশন।

৩০

গাইতেছে, স্বর-লহরী চঞ্চল
ব্যাপিতেছে নৈশ গগন, ভূতল;
কাঁপিতেছে ভ্রূ, নেত্র অচঞ্চল;
নাচিতেছে নেত্র, স্থির ভ্রূযুগল;
এক নেত্রে অশ্রু-মুক্তা সুশোভিত,
অন্য নেত্র দেখ হাসিতে রঞ্জিত।

৩১

কি আশ্চর্য মরি স্বর প্রকম্পন,—
এই গর্জ্জিতেছে মেঘের গর্জ্জন,
পরক্ষণে প্রেম কোমল তেমন,
পরক্ষণে পুনঃ করহ শ্রবণ,
আধ-আধ স্বর, বিরহে কাতর,
দু-নয়নে অশ্রু ঝরে দর-দর।

৩২

কেমন সংগীতে বিজলি দেখিয়া,
চিত্রবৎ আহা! আছে দাঁড়াইয়া!
চিত্রকর হলে, তুলি ধরিয়া,
লইতাম এই মুরতি আঁকিয়া।
না জানি কি সুখ, হায় রে, তাহার,
এমন ময়না পিঞ্জরে যাহার।

৩৩

কত রাজরার প্রেমের শিকল,
কেটে ফিরে এই ময়না চঞ্চল।
পাছে বিধাতার সৃষ্টির কৌশল,
না দেখিতে পায় মনুজ সকল,
তাই এ ময়না উদ্যানে-উদ্যানে,
ব্যাধ বধে ফিরে কটাক্ষ-বাণে।

৩৪

নাচ রে ময়না! নাচ রে আবার!
দুই কর তুলি নাচ আর-বার!
চন্দ্রানন হতে ঢাল একবার,
ঢাল রে সংগীতে অমৃতের ধার!
কি কটাক্ষ! হল জেনেছি এবার,
কাশী-নরেশের হৃদয় বিদার।

৩৫

কাশী-নরেশ। এ পদ্ধতি হায়।
বল মহারাজ কে দিল তোমায়?
যার ঈশ তুমি সে নর কোথায়,
ইংরাজের রাজ্য কাশী সমুদয়?

অর্থহীন এই পদ্ধতি তোমার,
মাথা নাহি যার মাথাব্যথা তার।

৩৬

বাঁচলেম বাপু! শূন্য সিংহাসন,
যাহাতে স্বাধীন ছত্রধরগণ
বিরাজিত, কাশী-নরেশে এখন
কলুষিত করি নাহি প্রয়োজন।
এই সিংহাসন, সিংহের আসন,
শৃগালেতে শোভা হবে না কখন।

৩৭

বাসনা একটি পুতুল আনিয়া,
শূন্য সিংহাসনে রাখি বসাইয়া।
তা হইলে গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া,
তা হইলে এই আগুনে জ্বলিয়া,
এতগুলি অর্থ বছর-বছর,
পূর্ণ করিবে না পাপের উদর।

৩৮

কি বলিব এই অর্থে, হে রাজন্!
বাঁচিত সহস্র দুঃখীর জীবন।
সহস্র দরিদ্র-দীন বাছাগণ,
পেতো বিনিময়ে বিদ্যারূপ-ধন।
কত অশ্রুধারা হইত মোচন,
কত শুভ-কার্য হইত সাধন।

৩৯

যেমতি ভারতে পুরাকালে হায়,
শোভিত আসর আলোক-মায়ায়,
যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পুরিয়া যামিনী সংগীত-সুধায়;
সেই নৃত্য-গীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য-বল।

৪০

ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল পুনর্বার,
সে-সব কথায় কাজ নাহি আর;

আজি বারাণসী আমোদ বাজার,
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আর-বার,
সুখের যামিনী হল অবসান?
বুড়ো-মঙ্গলের বাহিরিল প্রাণ।

কি লিখিব?

১

কি লিখিব? আশৈশব যারে মনেপ্রাণে
বসিয়াছি ভালো, সেই কুসুমে কামিনী
সহস্র যোজন দূরে, বিরলেতে অন্তঃপুরে,
স্মরণ করেছে আজি শৈশব-সঙ্গিনী।

২

কি লিখব? সুকুমার শৈশব সময়ে
নিরমল চিত্ত যবে, হৃদয়-উদ্যানে
যে কুসুম সুকোমল, বিরাজিত অবিরল,
হেরে সুমধুর হাসি, হাসিতাম প্রাণে।

৩

নিদারুণ দেশাচার উপাড়িয়া বলে,
অপর অদৃষ্ট ক্ষেত্রে করিল রোপণ;
এই জনমের মতো, সে আশা হয়েছে হত,-
কি লিখিব? আমার সে শৈশব-স্বপন!

৪

স্থানান্তরে মনান্তর হইয়াছে তার
ভেবেছিনু মনে, আমি পাইব না তারে;
একি শুনি পুনর্বার, এখনও সে আমার,
কি লিখিব? আমার সে প্রেম-প্রতিমারে!

৫

লিখিয়াছে—'পার তুমি ভুলিতে আমায়
আমি পারিব না কভু ভুলিতে তোমায়',—
ঘুচিল সন্দেহ মম, আমার জীবন-সম
আছে মম; তবে কেন কি লিখিব তারে!

কি লিখিব? এই লিখি,—জীবন-প্রতিমে?
দীর্ঘকাল পরে আজি কি ভাবিয়া মনে
নিস্তেজ অনল মম, করিলে হে উদ্দীপন,
অমৃত সিঞ্চনে কেন দহিলে জীবনে?

৭

সময়েতে যে আঘাত সহেছিনু প্রাণে,
আজি সে বেদনা মম হয়ে উত্তেজিত,
কি যন্ত্রণা মরমেতে, সেই অস্ত্র লিখা হতে,
ছুটিতেছে বেগভরে জীবন-শোণিত।

৮

কতদিন কত বর্ষ হইয়াছে গত,
এখনও বোধ হয় সকলি নূতন;
যেই প্রেম স্রোতস্বতী, হয়েছিল মৃদুগতি
আজি তার স্রোত-বেগ দুর্বার-ভীষণ!

৯

না পারি সহিতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস,
দুর্নিবার স্রোতধারা, বিদারিছে বুক,
কর্মনাশা সেতুপরে দাঁড়ানু বিষাদভরে,
অধোদৃষ্টি, স্থিরনেত্র, অবনত মুখ।

১০

স্মৃতি-দূরবীক্ষণে, মানস-নয়নে,
বিগত জীবন-দৃশ্য সুদূর-সুন্দর,
দেখিলাম কিছুক্ষণ, কি হইল দরশন?-
কোমল সুবর্ণ অঙ্গ, পাষাণ অন্তর!

১১

করাল কালের ঢেউ, অবস্থা তুফান,
কত শত আশা-পোত বিস্মৃতি-সাগরে
করিয়াছে নিমগন, নাহি তার নিদর্শন,
কিন্তু সেই প্রেমমূর্তি রহেছে অন্তরে।

১২

বিপদে, সম্পদে, কিবা সুদূরে, নিকটে,
রাজকার্যে, কি জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে,

দেখিয়াছি অনিবার, নাহি জানি কতবার,
বিসর্জ্জন করে পুনঃ তুলেছি যতনে।

১৩

কৌতুকে কল্পনা করে পরিণয়-হার,
পরায়েছি কতবার গলায় তাহার;
যথায় যেভাবে থাকি, তাহারে হৃদয়ে রাখি,
বলেছি সতত এই প্রতিমা আমার।

১৪

পূজিয়াছি চিরদিন সোনার মুরতি,
কোমল অন্তর তার, এই ছিল আশা,
এই প্রেম-প্রবাহিনী, সুধাময় সুরধুনী,
কে জানিত হবে শেষে নদী কর্মনাশা?

১৫

কিন্তু তারে মিছে দোষী, দোষী দেশাচার,
দোষী এ বাঙালি জন্ম, দোষী এ ভারত।
পিতামাতা অবিচারে, বিসর্জ্জিল অবলারে
পাপের অনলে, আহা দেখালো কুপথ।

১৬

দহিয়া-দহিয়া সেই বিষম আগুনে,
তরল হৃদয় তার হয়েছে পাষাণ,
কারো মূর্তি কদাচিত, হইবে না মুদ্রাঙ্কিত,
কোমল হৃদয় এবে বিকট শ্মশান।

১৭

সুকুমার প্রেমলতা এমন পাষাণে,
জন্মিবে না কোনকালে; হায় রে অবলা!
এমন অমূল্য ধন, কিসে দিয়ে বিসর্জ্জন,
রহিয়াছ সুখে, পাপ-নেশায় বিহ্বলা।

১৮

বলো প্রিয়ে! এ জীবনে কি সুখ তোমার?
এ বিস্তীর্ণ বিশ্বরাজ্যে নাহি একজন,
আমার বলিয়ে যারে, বরিবে প্রণয়-হারে
প্রদানিবে যাহারে হৃদয়-সিংহাসন।

১৯

ঊনবিংশতি বর্ষ প্রায় সমাগত,
বলো প্রিয়ে এ বয়সে ভ্রমেও কখন
নিরমল ভালোবাসা, বিশুদ্ধ প্রণয়-আশা,
দিয়াছে কি কোনজন, পেয়েছ কখন?

২০

সংসার কুহক যদি সত্য বুঝে থাকি,
"আমার" শব্দেতে সর্ব সুখ-পরিণত;
সে আমার, আমি তার, ইহা মনে আছে যার,
আবির্ভাব স্বর্গসুখ চিত্তে অবিরত।

২১

ছেড়ে দাও জীবনের শৈশব সময়,
যুবতী জীবন পেয়ে বলো না আমায়,
প্রকৃত প্রণয়সুখ, আনন্দে ভরিয়া বুক,
লভেছ কি একদিন লইয়া কাহায়?

২২

মনে কর বারেক সে শৈশব সময়,
শৈশব-সখায় তব আছে কি হে মনে?
কত কথা দুইজনে, প্রেম-উচ্ছ্বসিত মনে,
কহিয়াছি, শুনিয়াছি বসিয়া বিজনে।

২৩

নহে একদিন—কিবা নহে একমাস,
এইরূপে কত বর্ষ হইয়াছে গত;
একদিনে সে সময়, হতো নাকি সুখোদয়,
ভুলেছ কি এবে সব স্বপনের মতো?

২৪

যে মনে তোমায় ভালোবাসিয়াছি আমি,
নিরমল, পাপশূন্য, পাপ-আকাঙ্ক্ষায়
নহে কলুষিত তাহা তুমি কি জান না আহা!
ভালোবাসা-তরে ভালোবেসেছি তোমায়;

২৫

এমন সে ভালোবাসা—প্রতিদান তার
চাহি নাহি, চাহিব না নিকটে তোমার!

নিজ মনে নিজে সুখী, কি বলিব শশিমুখি।
অবিচল প্রেম প্রিয়ে! অন্তরে আমার।

২৬

এই বহে কর্মনাশা, ক্ষীণ-কলেবরা,
অত্যল্প জীবন, কিন্তু বন্ধ কর তারে,
আশু হবে সুগভীর, ভেসে যাবে দুই তীর,
ভেসে যাবে ধরাতল প্লাবন-আসারে।

২৭

তেমতি প্রণয়-স্রোত কর অবিচল,
মুহূর্তে পূর্ণিত হবে হৃদয়-ভাণ্ডার;
প্রণয়ে পূরিবে ধরা গগন হইবে ভরা,
অবিচল প্রেম-স্বর্গ—কেন বলি আর?

২৮

বিহ্বলা যুবতী-মূর্তি হোক না যাহারা,
সরলা-কোমলা সেই 'বালিকা' আমার;
সেই মূর্তি চিরদিন, থাকিবে হৃদয়াসীন,
প্রদানিব চিরদিন প্রীতি-উপহার।

২৯

চাহি না যুবতী-মূর্তি 'বালিকা-আমার।
সুন্দর সরল হাসি মাখিয়া অধরে,
সুন্দর-সরল দৃষ্টি, শীতল প্রণয়-বৃষ্টি,
করে যাতে, সেই মূর্তি জাগিবে অন্তরে।

৩০

সেই রূপে আজি মম চিত্ত পরিপ্লুত,
এই কর্মনাশা-জলে দেখি পরিষ্কার,
মনে রেখো প্রিয়তমে, আমি যে রাখিব মনে,
তুফান বহিছে হৃদে, কি লিখিব আর?

বাঙালির বিষপান

প্রয়োগ

১

বহিছে পবন স্বনিয়া-স্বনিয়া,
নিশ্বাসিছে তরু থাকিয়া-থাকিয়া,
উপর-আকাশে যেতেছে ভাসিয়া
নিবিড় জলদ, দিক আঁধারিয়া।

২

বহিছে পবন স্বনিয়া-স্বনিয়া,
ঝর-ঝর-ঝরে বরিষার জল;
পবন-পরশে বিরহীর হিয়া
বিরহ-অনলে জ্বলিছে কেবল।

৩

বিরহীর হিয়া জ্বলিছে কেবল,
যত ঝরিতেছে বরিষার জল;
বিরহীর হিয়া জ্বলিছে কেবল,
যতই বিদ্যুৎ করে ঝল-মল।

৪

গগনে জলদে গরজে গম্ভীর,
বহিছে জলার্দ্র শীতল পবন;
উথলিয়া ঢেউ প্রেম-জলধির
চাহে বিদারিতে হৃদয়-গগন।

৫

কোথায় গেলাস—ঢাল ব্রান্ডি, ঢাল,
নিবাইতে এই হৃদয়-উচ্ছ্বাস;
এমন ঔষধ—হেন মায়া-জাল—
মহৌষধি এই ব্রান্ডির গেলাস।

বিরাম

৬

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল,—যত পার খাও।
লুপ্ত হোক ভবে বাঙালির নাম!
দাসের জীবনে কি কাজ?—ডুবাও
সুরাপাত্র-মাঝে ধর্ম-অর্থ-কাম।

প্রয়োগ

৭

এখনো প্রিয়ার বদন-কমল
পড়িতেছে মনে; নয়ন-যুগল—
বিদায় কালের সে চিত্র সজল,
চারিদিকে শুধু নিরখি কেবল।

৮

ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল—ঢাল আর-বার;
এ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর;
কেন মনে পড়ে আবাব-আবার!
কেন শুনি সদা বচন তাহার?

৯

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি, ঢাল;
আর না—ঢের—হয়েছে এবার,
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলিছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

১০

যা বলে বলুক নির্বোধ চাষায়,
এমন জিনিস নাহিকো ধরায়;
ব্রাণ্ডি না থাকিলে, জ্বলিত সদায়,
মানব-জীবন দুঃখের শিখায়।

১১

সুখ যাহা বলো,—সে কথার কথা,
দেখেছ কি কেহ? পেয়েছে কখন?
আকাশকুসুম—মুকুতার লতা—
জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম?

১২

ওই আকাশের নীলিমা-মতন,
দুঃখই জীবন-স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বলো, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।

১৩

ওই নরপতি বসে সিংহাসনে,
মাথায় মুকুট, রাজদণ্ড করে;
ওই যে ভিক্ষুক অবসন্ন মনে;—
উভয় সমান অসুখী অন্তরে;—

১৪

তারতম্য এই—ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়,
ভুলিবে দরিদ্র, নিশীথে নিদ্রায়;
কত নরপতি সে সময়ে, হায়!
নীরবে ভিজাবে অশ্রুতে শয্যায়!

১৫

আজি সিংহাসনে—ধরার ঈশ্বর,
কালি রণাঙ্গনে—করেতে শৃঙ্খল;
গত ফ্রেঞ্চপতি,—'সিডন'-সমর—
স্মরি কার নাহি ঝরে অশ্রুজল?

১৬

নাহি রাজ্যে সুখ;—নাহি সুখ ধনে;
ধনে ধন-তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর;
চাতকের মতো শত বরিষণে,——
কোথা সুখ?—শুধু তৃষ্ণায় কাতর!

১৭

পুরাকালে এই তৃষ্ণা-অবতার,
সমগ্র পৃথিবী জিনি, বাহুবলে,
"নাহি রাজ্য ভবে, কি জিনিব আর?"—
বলিয়া, ভাসিল নয়নের জলে।

১৮

খোল ইতিহাস—জীবন-কানন,
বলো প্রবেশিয়া তাহার ভিতরে,

আছে কোন্ ফুল—কোন্ পুণ্যবান—
পশে নাহি কীট যাহার অন্তরে?

১৯

নাহি সুখ তবে এই ধরাতলে,
নাহি সুখ এই মানব-জীবনে;
আপন অবস্থা এই ভূমণ্ডলে,
নহে সুখকর, কাহারো নয়নে।

২০

বিশেষ বাঙালি চিরপরাধীন,
দাসত্ব-জনম দাসত্ব-জীবন;
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট-লিখন।

২১

ইহাদের, আহা! কি সুখ ভূতলে?
যেই ইন্দ্রজাল, দুঃখের জীবন
কার সহনীয় মানবমণ্ডলে?
শৌর্য, বীর্য, অসি, রাজ্য, সিংহাসন।

২২

নাহি ইহাদের; নাহি অনেকের
ঘরে অন্নজল; কি বলিব আর?
বাঙালি-জীবন-শোক-সমুদ্রের
কেমনে গনিব লহরী অপার?

২৩

পূজে সারাদিন প্রভুর চরণ,
যবে মৃতপ্রায় ফিরে আসি ঘরে;
ধরাতলে, আহা! কি আছে এমন,
জীবনের সাধ জন্মায় অন্তরে?

২৪

কি আছে এমন পারে ভুলাইতে
বিদেশিনী সেই প্রিয়ার বদন?
এমন কিছুই নাহি পৃথিবীতে,
যতক্ষণ নাহি পাসরি আপন।

২৫

. কিসে তব বলো আপনা পাসরি?
ডুবাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে?
কিসে ধরা-দুঃখ সব পরিহরি,
লভি স্বর্গ-সুখ প্রফুল্ল অন্তরে?

২৬

ব্রাণ্ডি;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ,
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার;
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস!

বিরাম

২৭

দাসত্ব-জ্বালায় মরিবারে চাও?
মরিবার তরে খুঁজিছো গরল?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও!
এ জ্বলন্ত বারি—তরল অনল।

২৮

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব,
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ।
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব!

২৯

এই তব ধার্য—এতেই গৌরব,
কোথা চন্দ্রগুপ্ত? কোথা হর্ষরাজ?
যশ, কীর্তি, বুদ্ধি—মিছা কথাসব;
ঢাল ব্রাণ্ডি—করো পুরুষের কাজ।

প্রয়োগ

৩০

আবার, আবার, ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল;
ঢের—সব দুঃখ ভেসেছে এবার;
ঘুরিতেছে ধরা, আকাশ, পাতাল,
উথলিছে চিত্তে সুখ-পারাবার।

৩১

বম্ ভোলানাথ! হর-হর-হর,
তুমি বিনে প্রভু, এই ভূমণ্ডলে
সুরার মাহাত্ম্য, অহে সুরেশ্বর,
কেমনে বুঝিবে নশ্বর সকলে?

৩২

সুরা হতে সুর, সুরপতি শুনি;
অসুর, অসুর সুরার বিহনে;
সুরা হতে মর্ত্যে নাম সুরধুনী,—
পতিত-পাবনী বিখ্যাত ভুবনে।

৩৩

বম্-বম্-বম্, হর-হর-হর,
মত্ত—দেবগণ সুরার লাগিয়া;
অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টির ঈশ্বর,
কারণ-সাগরে ছিলেন ভাসিয়া।

৩৪

সুরা হতে সৃষ্টি;—গোলাপি নেশায়,
শত সৃষ্টি পারি সৃজিতে হেলায়;
মধ্যম নেশায়—সৃষ্টি স্থিতি পায়;
প্রলয় কেবল, অধিক মাত্রায়।

৩৫

কোথাকার শশী কোথা গিয়া পড়ে,
পৃথিবী উপরে, নিচে নভস্থল ;
ঘোরে চরাচর চক্রের উপরে,
গিরি হয় নদী, সমুদ্র ভূতল!

৩৬

বম্-বম্-বম্, হর-হর-হর,
সুরাসুরে দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া;
শঙ্কর-ঝাপটে কাঁপি থর-থর,
সুধাভাণ্ড দিল মোহিনী ফেলিয়া।

৩৭

ফ্রেঞ্চ পুণ্যভূমে সে ভাণ্ড পড়িল;
মর্ত্যে ব্রান্ডি নামে বিখ্যাত হইল;

অধীনতা-দুঃখে—পবিত্র সলিল—
তারিতে বাঙালি, বঙ্গেতে আসিল।

৩৮

সঙ্গে তুমি—তুমি কে? যম? কি ভয়!
জানি আমি ব্রাণ্ডি তব উপাদান;
যেই বিষাধার বাঙালি-হৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান।

৩৯

শত মৃত্যু যার মুহূর্তে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তার কাছে কোন্ ছার!
এক যম তুমি—কি ভয় তোমার!
শত যম আছে উপরে আমার।

৪০

ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল, ঢাল আর-বার,
জ্বলিতেছে বুক!—হতেছে অঙ্গার,
জেতৃপরাজিতে সমান বিচার,
মাতর্ব্রাণ্ডি! যেন থাকে অনিবার!

আমার সংগীত

১

কি!—
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।
গায় নাকি কভু সুস্বরবিহীনে?
হরিষে, বিষাদে,—প্রণয়ে, বিরহে,—
শোকে, সুখে, হায়! হলে উচ্ছ্বসিত
হৃদয় তাহার? ছুটিলে, হায় রে,
মানব-হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ?

২

আসিলে বরিষা, সলিল-প্রবাহে
হয় না কি শুষ্ক পর্বতবাহিনী,
কলকল্লোলিনী,—কূলবিপ্লাবিনী?

আসিলে বসন্ত, গোলাপের সনে
ফুটে না কুফুল, কুসুম-কাননে?
গায় না কি কাক কোকিলের সনে?

৩

হায়, এই জড়-অজড় জগতে,
কে বলো নীরব? গাইছে সকল।
গর্জিছে জলধি, মন্দ্রিছে জীমূত,
ডাকে পশু, গায় বিহঙ্গ-নিকর।
আমি নর কেন নীরবে থাকিব?
গাইব না কেন?—অবশ্য গাইব।

৪

"গাও তুমি; কিন্তু শুনিবে না কেহ,
ঋষভ-কণ্ঠের নির্ঘোষ তোমার";—
বলিতেছ তুমি? শুনিও না তুমি
সংগীত আমার। ডমরু-নিনাদে
নাচিবে ভুজঙ্গ ফণা আস্ফালিয়া;
পশিবে মণ্ডূক সভয়ে বিবরে।

৫

মন্দ্রিলে জীমূত; ঘোর গরজনে
গায় গিরি; নাচে গায় পারাবার;
হাসে "বিদ্যুদ্দাম ঝলকে-ঝলকে"
সে রণ-সংগীতে, মরি, হাসি পায়,—
ফুলি অভিমানে উড়ায়ে পেখম,
নাচে সগরবে নির্লজ্জ শিখিনী!

৬

আজি বঙ্গদেশ নির্লজ্জ শিখিনী,
তুমি এক ক্ষুদ্র চন্দ্রক তাহার;
মুহূর্ত ঝলসি দর্শক-নয়ন,
ষাটি কোটি পুচ্ছে—পশিবে আবার।
তব তরে নহে মম এ সংগীত,
তব নাট্যশালা—ওই সুসজ্জিত!

৭

গাইছে রমণী, শুনিছে রমণী,
নাচিছে রমণী, দেখিছে রমণী,

রমণীর নৃত্য, রমণীর গীত;
রমণীর রাজ্য, রমণী-শাসিত;
প্রমীলার পুরী আজি বঙ্গদেশ!
মম এ সংগীত-বিড়ম্বনা শেষ।

৮

যথায় আদর কোকিলা-কণ্ঠের;
অবশ পুরুষ দেয় করতালি
রমণী-ব্যায়ামে,—জঘন্য খেমটায়;
যথায় দাসত্ব-শৃঙ্খল-শিঞ্জিত;
লক্ষ্ণৌ চেয়ে, (লক্ষ্ণৌ) টপ্পার আদর;
তথা এ সংগীত, মানি—হাস্যকর।

৯

গর্জেছিল এই সংগীত আমার,
পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে;
শিঞ্জিনী-শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্জনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে।
সেই সংগীতের হইয়াছে, হায়।
শেষ তান লয় 'চিলেন্‌ওয়ালায়'।

১০

আজি সেই বীর সমাধি-ভবনে
জাগিবে কি সেই সংগীত আবার?
এই রাশিকৃত শীতল অঙ্গারে
এক কণা অগ্নি হবে কি সঞ্চার?
লৌহে লৌহে হয় অগ্নি উদ্‌গিরণ;
লোহায়, অঙ্গারে?—ভস্মের নির্গম!

১১

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর-সংগীত আমার?
কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর?
বরঞ্চ পশিয়া হিমাদ্রি-কন্দরে
শুনাব সংগীত ওই কেশরীরে।

১২

গাইব তাহার তীব্র পরাক্রম,
গাইব তাহার বীর অবয়ব,
গাইব তাহার দুর্জ্জয় নখর,
গাইব তাহার গর্জ্জন ভীষণ।
অতৃপ্ত উদর,—অসংখ্য দশন,—
গাইব তাহার রক্তিম লোচন।

১৩

শুনিয়া সংগীত, নাচিবে নির্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া;
জাগিবে পাষাণ, গর্জ্জিবে জীমূত;
বনে দাবানল উঠিবে জ্বলিয়া।
গাবে প্রতিধ্বনি ভীষণ নির্ঘোষে,
দূরে মহাসিন্ধু উত্তরিবে রোষে।

১৪

কিম্বা বসি সেই মহাসিন্ধু তীরে,
মহা-অম্বুসহ কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব নির্ঘোষে সংগীত আমার
মহানন্দে, মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
শুনিয়া সংগীত ঘন গরজিয়া,
ঘন ঘনরাশি আসিবে উড়িয়া!

১৫

ফাটিবে জলদ; ছুটিবে বিদ্যুৎ—
তীব্র অগ্নিবাণ বিদারি গগন!
মাতিবে জলধি; ছুটিবে তরঙ্গ—
বরুণাস্ত্র শত, সহস্র—ভীষণ!
তখন আনন্দে করিয়া ঝংকার,
রণরঙ্গে কবি পাবে পুরস্কার।

চিত্র

১

মরি কিবা প্রতিবিম্ব নয়ন-দর্পণে
হল বিভাসিত আজি; দেখিয়াছি হায়,
পূর্ণিমা শারদ-শশী সুনীল গগনে;
দেখিয়াছি সরোজিনী সলিল-শয্যায়।

২

দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখ-স্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু-চিত্র দেখিনি কখন।

৩

দেখিব কি! দেখিলে কি নয়ন মোহিত
পারে কেহ ফিরাইতে? রবে অবিরত
মুগ্ধদৃষ্টি এক স্রোতে চিত্রে প্রবাহিত;
চিত্র দেখি হইলাম চিত্রিতের মতো।

৪

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু-শরে
কুসুম-শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?

৫

সুগোল সুবর্ণনিভ চারু-ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ-বিকশিত-বদন-কমল,
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!

৬

শোভিতেছে অন্য করে কাব্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর-থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,—
পুণ্যবান কবি—কাব্য-পুণ্যের আকর!

বিনোদ-বদন-চন্দ্র, বিনোদ-নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ;
অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিব-মোহন,
অঙ্গে-অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস-আবেশ।

৮

বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে—সর্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ—সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে-তলে কনক-লহরী।

৯

এইরূপে বিরহিণী বিনোদ-কামিনী—
চিত্রময়ী! চিত্রপটে রয়েছে শায়িত
অযতনে—অনিমেষ, কুসুমশায়িনী,
চিন্তাকুলা! চিত্রতলে রয়েছে লিখিত —

১০

'বিরহেতে বিষাদিনী, বিরহযাতনা
ভুলিবার তরে মনে সদা আকিঞ্চন;
রতনভূষণ ত্যজি পাঠেতে মগনা,
তথাপি বিরহানল দহিছে জীবন।"

১১

পুণ্যবান তুমি! হায়, যাহার লাগিয়া
এই প্রেমময় চিত্র চিন্তায় অচল,
শত পুণ্যবান তুমি—যাহার লাগিয়া
হায়, এই চিত্রময় বিরহ-অনল!

১২

অতুল ঐশ্বর্য তব,—অসংখ্য রতনে
পূর্ণিত ভাণ্ডার তব, রত্নাকর জিনি!
সকল রত্নের রত্ন—দুর্লভ ভুবনে!
অমূল্য রতন এই বিনোদ-কামিনী!

১৩

হেন রত্ন, হায়, যার কণ্ঠের ভূষণ,
তাহার জীবন-পথ উজ্জ্বল সতত

পবিত্র প্রণয়ালোকে—মানব-জীবন
নন্দন-কাননে ইন্দ্রসুখ-স্বপ্নমত!

১৪

উজ্জ্বল সুদূরস্থায়ী ভানুর প্রতিমা
দেখে যথা ক্ষুদ্র নর প্রতিবিম্বে জলে;
কিম্বা যথা দেখে সেই অনল-গরিমা
সুদূরবীক্ষণে কিম্বা বিজ্ঞান-কৌশলে;

১৫

তেমতি কি পুণ্যবলে এই রূপরাশি
দেখিলাম প্রতিবিম্বে এই চিত্রপটে;
নিরখিব স্মৃতি-নেত্রে, রবে দিবানিশি
চিত্রময়ী মনে, চিত্র নয়ন-নিকটে।

১৬

হরিষে-প্রণয়ে রক্ত-অধর-যুগল—
চিত্রে অচঞ্চল—যবে বর্ষে সুসংগীত;
সেই সুললিত কণ্ঠ—মধুর তরল,
হৃদয়ে পবিত্র প্রেমে করি উচ্ছ্বসিত;—

১৭

বড় সাধ সে সংগীত শুনি একবার,
বড় সাধ নিরখি সে আচ্ছন্ন নয়ন—
কমল-কোরক,—যবে স্নেহের আসার
বিকাশে ত্রিদিব-শোভা, উজ্জ্বল বরন।

১৮

না দেখি, না শুনি;—কিন্তু দেখিব-শুনিব
কল্পনার নেত্রে, কর্মে দিবস-যামিনী;
পবিত্র স্বপনে কিম্বা শুনিব, দেখিব,
চিত্রময়ী কণ্ঠ, চিত্র বিনোদ-কামিনী।

স্নেহোপহার

১

বাছা রে!
কি আনন্দ আজি—আনন্দ অপার—
উথলিছে এই দুঃখিনী-মনে,
হেরি তোর মুখ, প্রীতি-পারাবার,
আনন্দে নাচিছে সন্তানগণে।

২

বাছা রে!
আর্যভারতীয় বরপুত্র তুমি;
রত্নগর্ভা এই ভারত-সাগরে
মহারত্ন তুমি, আজি আর্যভূমি,
সমুজ্জ্বল তব চিরোজ্জ্বল করে।

৩

বাছা রে!
হৃদয় তোমার কোমল-সরল,
মানবের প্রীতিপবিত্রতাময়,
পরদুঃখে সদা দয়ার্দ্র-তরল,
স্বর্ণ-প্রেমগঙ্গা হৃদয়েতে বয়।

৪

বাছা রে!
কাঁদি দিবানিশি সমুদ্র-বেলায়,
অশ্রু দুই নদী ধারায় বয়,
কি সুখ যখন তব কীর্তি, হায়!
প্রতিধ্বনি করে পর্বতনিচয়।

৫

বাছা রে!
কত যে বাসনা আছিল অন্তরে,
দেখিতে তোমার কোমল মুখ,
পূরিল বাসনা, আনন্দ-সাগরে
ভাসিতেছে আজি শ্যামল বুক।

৬

বাছা রে!

রেখেছি খুলিয়া প্রকৃতি-ভাণ্ডার,
দেখ নেত্র ভরি, ভাবুক তুমি,
পর্বত, নির্ঝর, মহাপারাবার,
দেখ প্রকৃতির চারু-রঙ্গভূমি।

৭

বাছা রে!

তোমার কীর্তির অমর প্রভায়
হউক উজ্জ্বল ভারত-বদন;
প্রেম-স্বর্ণলতা দুলুক গলায়,
আশীর্বাদ করি, আদরের ধন!

প্রণয়োচ্ছ্বাস

১

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?
অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?
আনচান করে প্রাণ;
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান;
কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল?

২

কেমনে জন্মিল ব্যথা?—আমি কি তা জানি না?
প্রেয়সী রে নিরদয়!
কিন্তু যার জন্যে জ্বলি, সে যে জেনে জানে না।
প্রেম ভুলিবার নয়,
কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

৩

প্রিয়তমে! এই কি রে ছিল তব অন্তরে?
আশা-ইন্দ্রধনু দূরে দেখাইয়া অম্বরে

কেন তৃষা বাড়াইলে?
যদি নাহি জুড়াইলে
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে?

৪

কি আর বলিব, প্রিয়ে! কত আর বলিব?
তাপিত-তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব?
এই পাই, এই নাই,
হারাইয়া পুনঃ পাই,
মরে বেঁচে, বেঁচে মরে, কতকাল থাকিব?

৫

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে!
কি অনলে এ হৃদয় সারানিশি দহেছে!
তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে!
অন্ধকারে নিরখিয়ে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে! সারানিশি বহেছে!
কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে! গত নিশি গিয়েছে!

৬

কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরেছি;
কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, সুখ-ভঙ্গে কেঁদেছি।
এইরূপে কেঁদে, হেসে,
দুঃখের সাগরে ভেসে,
প্রেয়সি রে! মনোদুঃখে গত নিশি কেটেছি।

৭

হবে না আমার, প্রিয়ে! যদি মনে জেনেছো;
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছো?
বলো, প্রাণ! একবার,—
হবে না আমার আর,
ভস্ম হোক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হতেছে।

স্থির-সৌদামিনী

১

লিখিব লিখিব হতেছে বাসনা,
কি লিখি কি লিখি ভাবিয়া চাই,
শোভিছে প্রকৃতি ধূসর-বরনা,
বরিষার জলে দেখিতে পাই।
বরিষার জলে দেখিতে পাই,
এই শৃঙ্গ হতে পূর্ণ স্রোতোস্বতী
করিয়া যেমন যৌবন-বড়াই,
সাগর-সদনে চলেছে যুবতী।

২

যুবতী যৌবন যায় গড়াইয়া,
যায়-যায়-যায়—থাকে না আর;
উন্মত্ত জলধি আকুল হইয়া,
আলিঙ্গন-সুখ পাইতে প্রিয়ার,
সহস্র তরঙ্গে করিছে বিস্তার
সহস্রেক কর; করিতে বর্ধন
সম্মিলন-সুখ, প্রকৃতি আবার
করিতেছে সুধা-বারি-বরিষণ।

৩

স্বনিছে পবন সর-সর-সর,
ঝরে বরিষার ধারা অবিরল;
এই শৃঙ্গ হতে কত মনোহর
সেই সুমধুর সংগীত তরল।
নদী, সরোবর, নির্ঝর, ভূতল,
বরিষার জলে প্লাবিত-প্রায়;
পর্বত, পাদপ, প্রাচীর সকল
সলিলে বেষ্টিত চিত্রিত দেখায়।

৪

এই চারু ছবি হইল বাসনা,
চিত্রিয়া রাখিতে কবিতা-মন্দিরে;
কিন্তু এই চিত্রে কি কাজ বলো না?
কত-শত ছবি আছে সে প্রাচীরে?

অথবা কেমনে ওই ধীরে-ধীরে
নাচে যে হিল্লোল জলের উপরে,
ওই যে বিশ্ব-শোভা কাঁপিছে সমীরে,
চিত্রিবে সহজে নর-চিত্রকরে?

৫

ভালো বটে, কিন্তু মনে নাহি লয়,
লইতে সাহায্য প্রিয় কল্পনার;
আজি-কালি তিনি সর্বভূতময়!
মধুর ভাণ্ডারে বসতি যাহার,
ভ্রমে এবে, হায়! দূরদৃষ্ট তার!
বাজারে-বাজারে, বঙ্গ-ক্ষেতে-ক্ষেতে!
নিত্য মুদ্রাযন্ত্র-পীড়নে তাহার
অঙ্গভঙ্গি দেখি, মরি খেদেতে।

৬

হেন কল্পনায় কাজ নাহি আর,
স্বভাবে স্বভাব চিত্রিব আজি।
আবার জগৎ হইল আঁধার,
ভাসিল আকাশে জলদরাজি।
ধন্য রে প্রকৃতি! তব ছায়াবাজি,
গম্ভীর গর্জনে গর্জে কাদম্বিনী,
শোভে ক্ষণে-ক্ষণে গগনে বিরাজি,
জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী।

৭

জলধর-কোলে চল-সৌদামিনী,
ক্ষণেকে দেখায়—ক্ষণেকে লুকায়,
ক্ষণে-ক্ষণে পুনঃ জলধর-ধ্বনি,
ঘর্ঘর গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপায়।
দেখিয়া হলেম মগ্ন ভাবনায়!
ভয়ংকর রূপ; শব্দে কান কালা।
বজ্রে বাঁধা বুক! শরীর-শিলায়,
তার কোলে এই রূপসী বালা?

৮

না জানি কি ভাবি মূঢ় কবিগণ
এই দৃশ্য দেখি আহ্লাদে ভাসে;

দাম্পত্য প্রণয় ভাবে মনে মন,
দেখি সৌদামিনী জলধর-গ্রাসে।
বলে শোভে প্যারী শ্রীকৃষ্ণের পাশে,
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী,
প্রণয়ে জগৎ মরিবে হতাশে,
প্রেমাদর্শ যদি মেঘ-সৌদামিনী।

৯

চমৎকার প্রেম! ভয়ংকর রব!
প্রেমালাপ বুঝি মেঘের গর্জন?
নাগরের রূপে আঁধার নগর!
প্রেম-আলিঙ্গন অশনি-পতন?
সৌদামিনী-প্রেমে হইয়া মগন,
প্রাণভয়ে বুঝি ছুটিয়া পালায়?
প্রেম-মুগ্ধ মেঘ, কৃতান্ত যেমন,
ঘন ভীম রোলে পশ্চাতে ধায়?

১০

কেমন নিষ্ঠুর বিধাতার বিধি,
দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, বুঝা নাহি যায়;
এমন অতুল সুরূপের নিধি,
কেমনে সঁপিছে বজ্রের শিখায়?
বিকচ গোলাপ অনল-জ্বালায়,
শরতের শশী রাহুর গ্রাসে,
দুর্লভ রতন কাকের গলায়,
দেখি কার চক্ষে জল না আসে?

১১

এতাধিক আরো নিষ্ঠুর নির্দয়,
বিধাতার বিধি দেখিতে কি চাহ?
আনো তুলি-রঙ, আনো সমুদয়,
দেখাইব চিত্র শোকের আবহ।
জানো না মানব-জীবন-প্রবাহ;
দুঃখেতে মলিন বরন তার,
বারেক ভিতরে প্রবেশিয়া চাহ,
কত-শত রত্ন-কীটের আধার।

১২

চিত্র আগে এক রূপসী বালা,
রূপের আকর—গুণের গরিমা;
সহি মনে-মনে নিরাশার জ্বালা,
বিনোদ-বদনে পড়েছে কালিমা।
নবদুর্গা জিনি প্রেমের প্রতিমা,
নিরাশা-ব্যঞ্জক যুগল নয়ন,
কিন্তু, হায়! সেই নয়ন-নীলিমা,
স্নেহে সিক্ত সদা-কোমল দর্শন!

১৩

লয়ে এই ছবি যাও বঙ্গালয়ে,—
নিরানন্দ বাস—বিষাদের খনি!
ভ্রমি গৃহে-গৃহে বলো সমুদয়ে,
কত গৃহে হেন রমণীর মণি
অপাত্র-অম্বুদে, অপ্রেম-অশনি
সহিতেছে, হায়। দিবস-যামিনী
অচল হৃদয়ে! শোভিতেছে ধনী
জলধর-কোলে স্থির-সৌদামিনী।

আর কি দেখিব?

১

যে সুখ-স্বপন আজি দেখিলাম, হায়!
আর কি দেখিব?
নিদ্রার তামস গর্ভে এমন উজ্জ্বল মণি
আর কি পাইব?
বিষাদ-নীরদে মাখা জীবন-আকাশে, হায়,
দেখিব কি হেন তারা, কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়?

২

নবদূর্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে
দেখিলাম হায়!
নিদাঘ-নিশিতে সুখে, নিশানাথ করতলে
শুইয়া ধরায়।

মধুর এস্রার-তানে, চন্দ্রমা হাসিতেছিল,
জীবন হইতেছিল শীতল কৌমুদীময়।

৩

কখন বাজিতেছিল, মরি সে সংগীত!
মধুর এস্রারে।
বামাকণ্ঠ সুললিত, প্রণয়পূরিত গীত,
উদাস সংসারে!
কখন গর্জিতেছিল, অভিমানে ঝঙ্কারিয়া,
কখন কাঁদিতেছিল, বিরহেতে উচ্ছ্বসিয়া;

৪

বিরাজে চঞ্চল, তারে,—বসন্ত, শরৎ,
ষড়-ঋতুগণ;
পিককণ্ঠ বসন্তের, মেঘমন্দ্র শরতের;
নিদাঘ-দাহন;
ঘন বরিষার ধারা; শিশিরের কুজ্ঝটিকা;
কভু নন্দনের শোভা; কভু শুষ্ক মরীচিকা।

৫

হৃদয়ের কত ভাব, সেই কলকণ্ঠে
উঠিল জাগিয়া,—
সুখের শৈশব-কাল, কখন পড়িল মনে;
উঠিল বাঁচিয়া
মৃত স্মৃতি, সেই স্রোতে বহে প্রতিবিম্ব, হায়!
স্বর্গীয় জননী-মুখ, জনকের প্রতিমায়।

৬

শিয়রে করুণাময়ী, জননীরূপিণী,
বসিয়া আদরে;
স্নেহসিক্ত করপদ্ম বুলাইতেছিলা মাতা
মম কলেবরে।
স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, সুকুমার শিশুগণ,
মধুমাখা ছাই-পাঁশ করিতেছে বরিষণ!

৭

আর কি দেখিব সেই দৃশ্য মনোহর—
পবিত্র-নির্মল!
আর কি দেখিব, হায়! উদার মুরতি তব
সুন্দর, সরল!

জননীর স্নেহবাণী, শিশুকণ্ঠ সুধাময়,
আর কি শুনিব কভু? জুড়াইব এ হৃদয়!

৮

পরিবরতিল স্বপ্ন! সজ্জিত তরণী,
ওই নদী-তীরে;
আছে দাঁড়াইয়া তুমি, আছি দাঁড়াইয়া আমি,
অশ্রু ঝরে ধীরে।
নৈশ অন্ধকারে, হায়, কেহ নাহি দেখি কারে,
যুগল হৃদয় কিন্তু, দেখিতেছি পরস্পরে!

৯

আমারে হৃদয়ে ধরি, বলিয়া কাতরে,—
"আর কি দেখিব"?
তোরে দেখি যেই সুখ পাই আমি, সেই সুখ,
আর কি পাইব?
আশীর্বাদ করি বৎস! তোরা পঞ্চ-সহোদরে
রক্ষিবেন অনুক্ষণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে!

১০

হতভাগ্য অন্ধ নর! শুনে আজি তব
কাঁদিবে অন্তর,
কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া মম
এক সহোদর!
বহিতেছে নিরন্তর সেই স্রোত দুর্নিবার!
আর কি দেখিব? আহা! ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

কেন ভালোবাসি

১

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালোবাসি?
আজি পারাবার-সম,
হায়, ভালোবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালোবাসি?

২

অনন্ত-অতল সিন্ধু!—পশি বারি-তলে,
কেমনে বলিব বলো,
কোথা হতে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যার,
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার?

৩

যে তরু অনন্যছায়া হৃদয় আমার
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে!
কেমনে চিরিয়ে হিয়ে,
দেখাব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?—
কেন ভালোবাসি, হায়! বুঝাব তোমায়,

৪

হায় রে, হৃদয় যবে কিশোর-কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়
কেমনে অঙ্কিত, হায়,
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জানো, শশধর।
কেন ভালোবাসি, তুমি দাও না উত্তর।

৫

তুমি কাল! জান তুমি, নিরাশ-অনলে
গোপনে হৃদয় মম,
পোড়ায়ে পাষাণ-সম
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর তাহায়
স্মৃতি-অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায়।

৬

কতদিন, কতবর্ষ, জানো তুমি কাল,
এ হৃদয় যার তরে,
জ্বলিয়াছে স্তরে-স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন,—
কেন ভালোবাসি তারে, কহ না এখন?

৭

কেন বাসি ভালো? অয়ি সচন্দ্র শর্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি,

এ হৃদয় কনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

৮

ছিলো এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
একটি নক্ষত্র তায়
ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী?—
কেন ভালোবাসি, কহ সচন্দ্র শর্বরি!

৯

শর্বরি! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিযাছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালা-রাশি;
শর্বরি! কহ না তুমি কেন ভালোবাসি?

১০

তব অন্ধকারে, সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে,
নিত্য যে বিরাজ করে,
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,—
হৃদয়বাসিনী মম জীবন-জীবন।

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুন্তল;
সুকুন্তল কিরীটিনী
প্রেমের প্রতিমাখানি,
আ-চরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি,
দেখিয়াছি, কহো তবে কেন ভালোবাসি?

১২

সে কেশ আঁধারে সে রূপ কোহিনুর,
সে বদন-চন্দ্র? না-না,
সে আনন্দ-পদ্ম? তাও না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র; হায়, তৃষ্ণাতুর।

১৩

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি! জাগ্রতে-নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাদান,
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ,
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ-সুশীতল।
কেন ভালোবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল?

১৪

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্তি, ধন, মান,——
তৃণবৎ ঠেলি পায়
আসিনু উন্মাদপ্রায়
যার কাছে, হায়! তার মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালোবাসি তারে?

১৫

তুমি পত্র তুমি চিত্র—সর্বস্ব আমার!
অক্ষরে-অক্ষরে পত্রে,
রেখায়-রেখায় চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায়!
কেন ভালোবাসি, আহা, বলো না তাহায়?

১৬

কেন ভালোবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি,
মধ্যে এই মরুভূমি
নির্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে-হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর।

১৭

কেন ভালোবাসি যদি শুনিতে বাসনা,
নিষ্ঠুর সংসার-ধাম;
ছাড়ি বনে যাই, প্রাণ!
সাজিয়া নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,
প্রণয়-সংগীতে ভাসি দিবস-যামিনী।

১৮

খাব বন-ফল-মূল, পরিব বাকল;
সাজাইয়া বনফুলে,

বসি বন-স্রোত-কূলে,
কব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
নির্ঝরের কলকলে, কেন ভালোবাসি।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জনে,
রবিকরে মনোলোভা,
দেখি দূর সিন্ধু-শোভা,
প্রকৃতির সান্ধ্য-শোভা নিরখি নয়নে,
কব কেন ভালোবাসি প্রেমানন্দ মনে।

২০

কপোত-কপোতী মতো মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া
বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া তোমায়,
কেন ভালোবাসি, কবে নীরব ভাষায়।

২১

পারিবে না? ভীমরবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল?
অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চলো পশিগে তথায়,
কেন ভালোবাসি, প্রাণ! কহিব তোমায়।

২২

না পারো; দাঁড়াও তুমি সংসার-বেলায়,
প্রেমের প্রতিমাখানি,
দেখিতে-দেখিতে আমি,
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি,
চাহিও, বুঝিবে, হায়, কেন ভালোবাসি।

যাই

যাই,—
ফাটিল হৃদয়, ফাটি আগ্নেয় ভূধর,
হায় রে! হইল শেষে হইল নির্গত
"যাই" কথাতীব্রানল; প্রাণের ভিতর
জ্বলিল নির্বাণ-বহ্নি জনমের মতো।

যাই,—
মেঘরূপী সেই কাল অদূরে দেখিয়া,
উঠিতাম সুখ-স্বপ্নে উভয়ে শিহরি,
মস্তক-উপরে সেই জলদ আসিয়া,
প্রহারিল বজ্র, ওই "যাই" ধ্বনি করি।

যাই,—
সেই ভুজঙ্গের কথা ভাবিয়া অন্তরে,
হায় রে! হইতে, প্রিয়ে! কাতর এমন,
সেই কালসর্প—সেই তীব্র বিষধরে—
যুগল হৃদয়ে, হায়, করিল দংশন।

যাই,—
হায় রে, সুখের দিন, সুখের শর্বরী
পশিল, প্রেয়সি! ওই স্মৃতির সাগরে,
অনন্ত বিচ্ছেদ-শিখা ওই ভয়ংকরী,
হইতেছে প্রজ্বলিত পূরব অম্বরে।

যাই,—
প্রভাতিছে সুখ-নিশি, এ প্রভাতে আর
আনিবে না পুষ্পোদ্যানে তপস্বী তোমার।
প্রভাত-কিরণ-জালে হাসিবে আবার
পুষ্পবন, পুষ্পময়ী মুরতি তোমার।

যাই,—
কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল কুসুম-উদ্যানে
দেখিবে না আর তুমি,—অতৃপ্ত নয়নে
নবীন ভাবক তব চাহি তব পানে,
সমুজ্জ্বল মুখ, তব রূপের কিরণে।

যাই,—
চুম্বিবে প্রভাতানিল উদ্যান-কুসুম,
চুম্বিবে কুসুম-শ্রেষ্ঠ তোমার বদন:
চুম্বিবে তোমার,—ছাড়ি উদ্যান-প্রসূন—
অনন্ত অমৃতপূর্ণ অধর, নয়ন।

যাই,—
কিন্তু সে প্রভাতানিলে করিবে না আর
আমার হৃদয়ে সেই সুধা বরিষণ,
বহিত যে, হায়! মম আনন্দ অপার,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এবে করিবে বহন।

যাই,—
নদী-বক্ষ হতে যবে রূপের লহরী
ছড়ায়ে যাইবে, প্রিয়ে! দেখিবে না আর
বসিয়া যুবক এক ধৈর্য পরিহরি
নিরখিতে সদ্যোস্নাত বদন তোমার।

যাই,—
বসি কাছে তরুতলে, দেখিবে না আর
উন্মত্ত যুবক কেহ হাসিতে-কাঁদিতে;
শুনিয়া মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি তোমার
অচল হৃদয় সুখ-সাগরে ভাসিতে।

যাই,—
সেই সুখ,—করে কর, নয়নে নয়ন,
থেকে-থেকে মুখে মুখ, অধরে অধর,
মদালস চারি চক্ষু স্থিত সম্মিলন,
নয়নে-নয়নে কথা,—সংগীত সুন্দর!

যাই,—
অকৃত্রিম প্রণয়ের এই অভিনয়
ফুরাইল; ফুরাইল হায় রে! আমার
জীবনের এই অঙ্ক মাদকতাময়,
বিষাদ-তরঙ্গ ওই সম্মুখে আবার।

যাই,—
বন হতে বনান্তরে,—জাহ্নবী-হৃদয়ে
চঞ্চল তরঙ্গে চলো-গোলাপ-মতন,

বেড়াইবে যবে, স্থির অনিমেষে, হায়
ভ্রমিবে না নেত্র মম চুম্বিয়া চরণ

যাই,—
সায়াহ্নে সরসী তীরে, অথবা কাননে,
দেখিবে না সেই যুবা বিহ্বল হৃদয়,
সন্ধ্যালোকে বন-শোভা না দেখি নয়নে,
দেখিতে তোমার মুখ চারু-শোভাময়।

যাই,—
আসিবেক সন্ধ্যা, কিন্তু আসিবে না আর
সেই সুখ-সন্ধ্যা মম। বহিবে সমীর,
কিন্তু সেই সন্ধ্যানিলে পাবে না তোমার
সুরভি-নিশ্বাস মম ইন্দ্রিয় অধীর।

যাই,—
বসি জ্যোৎস্নায় স্নাত রজত-প্রাঙ্গণে,
জ্যোৎস্না-রূপিণী তুমি হাসিবে যখন,
জ্যোৎস্না-সাগরে, নাহি দেখিবে নয়নে,
হায় রে ছুটিবে যেই লহরী তখন।

যাই,—
হায় রে, নিশীথে সেই অবশ অন্তরে,
চুম্বন, রোদন, প্রতিরোদন, চুম্বন;
হৃদয়ে-হৃদয়ে কথা, অস্ফুটিত স্বরে
প্রাণপূর্ণ সম্ভাষণ, প্রতিসম্ভাষণ।

যাই,—
হবে সব স্বপ্ন; কিন্তু অধরে-অধরে
যে মদিরা, প্রেমময়ি! করিয়াছি পান,
তরল বিদ্যুৎ-মতো পশেছে অন্তরে,
শোণিতে-শোণিতে তাহা রবে বিদ্যমান।

যাই,—
পোহাইছে নিশি, যাই বিদায় এখন;
প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা বুঝিতে না পারি;
দুইটি জীবনে করি সন্ধ্যা সমাগম,
কি ফল তাদের চক্ষে প্রভাত সঞ্চারি?

যাই,—

আমার জীবন, প্রিয়ে, তমিস্রা রজনী,
তব দরশন তাহে জ্যোৎস্না-সঞ্চার,
অস্ত যায় সে জ্যোৎস্না, অয়ি প্রণয়িনী।
করিয়া জীবন মম চির-অন্ধকার।

যাই,—

আর কেন, রাখি, বুকে কমল-বদন,
কেন, অশ্রু তরলাগ্নি ঢালিছ হৃদয়ে?
শুনিছকি হৃদয়ের ঝটিকা-গর্জন?
শুন তবে, চক্ষে যাহা দেখিবাব নহে।

যাই,—

ওই দেখো, পূর্বাকাশে আলোক-লহরী
ছড়াইছে উষা ওই পোহায় যামিনী;
এরূপে কি হায়! মম বিষাদ-শর্বরী
পোহাইবে আশাময়ী উষা সুহাসিনী।

যাই,—

এসো বুকে,—আহা! তৃপ্তি হল না আমার;
আনো ছুরি, চিরি বুক বুকের ভিতরে
রাখি ওই মুখখানি, প্রতিমা তাহার
তাহলে মুদ্রিত চির হইবে অন্তরে।

যাই,—

প্রিয়তমে!—প্রেমময়ি!—জীবন আমার!
তোলো মুখ,—চাও প্রিয়ে!—একবার চাই
একটি চুম্বন,—চিত্ত ভরিল আমার;
বিদায় জন্মের মতো,—যাই তবে,—যাই।

দ্বিতীয় সর্গ

কাটোয়া ব্রিটিশ-শিবির

১

দিবা অবসান-প্রায়; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজিশিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপর ; নিচে নাচিছে রঙ্গিণী
চুম্বি মৃদু কলকলে মন্দ-সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

২

অদূরে কাটোয়া-দুর্গে ব্রিটিশ-কেতন
উড়িছে গৌরবে, উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গা পার,—অস্ত্র ঝলঝলে;
দূর হতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে।
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন।

৩

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্-ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন

তালে-তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্-ঝনন্;
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জ্জিছে বারণ।
থেকে-থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে-ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে; ধীরপদ, কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমে'র ঝর্ঝর রব, 'বিগুল'-ঝংকার,
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিশের বীর্য-অহংকার।

৪

নীরবে—সৈন্যের স্রোত বহিছে নীরবে
অতিক্রমি ভাগীরথী; বিরাজে বদনে
গম্ভীরতা-প্রতিমূর্তি। আসন্ন আহবে
বিমল চিন্তার স্রোত উচ্ছ্বাসিছে মনে
হতভাগ্যদের, আহা! প্রতিবিম্ব তার
ভাসিছে নয়নে, ওই ভাসিছে বদনে।
পারিতাম যদি আমি চিত্রিতে সবার
বদনমণ্ডল, তবে মানবের মনে
যত সুকুমার ভাব হয় উদ্দীপিত,
এই চিত্রে মূর্তিমান হত বিরাজিত।

৫

কোন হতভাগা আহা! বসিয়া বিরলে
প্রেমের প্রতিমা পত্নী স্মরিয়া অন্তরে
নীরবে ভাসিছে দুই নয়নের জলে;
ভাসে ভারাক্রান্তচিত্ত বিষাদ-সাগরে।
ভুলেছে সমরসজ্জা, না দেখে নয়নে
শিবির,—সৈনিক,—সেনা,—নদী ভাগীরথী;
রণবাদ্য ঘন রোল না পশে শ্রবণে;
প্রেমমন্ত্র-মুগ্ধ-চিত, প্রেম-মুগ্ধ-মতি।
কেবল দেখিছে প্রিয়া-বদন-চন্দ্রিমা,
কেবল শুনিছে প্রেম-ভাষা-মধুরিমা।

৬

কোথায় বা বিদায়ের হৃদয়বেদনা
স্মরিয়া মরমে, আহা! চিত্রি স্মৃতিবলে
প্রণয়িনী-বদনচন্দ্রমা,

বিকচ গোলাপ যথা শিশিরের জলে,—
নেত্রনীলোৎপল হতে প্রেমে উচ্ছ্বসিয়া
ঝরেছিল যেইরূপে অশ্রুমুক্তাবলী,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশিরবিন্দু সমীরণে টলি;
বেণীমুক্ত কেশরাশি; অলক্ত অধর,
সতত সরস, পূর্ণ অমৃতশীকর;—

৭

কাঁদে কোন্ হতভাগা, ভাবে নিরন্তর,
আর কি সে চারু-মুখ দেখিব নয়নে?
আর কি সে প্রেমময়ী-কোমল-অধর
চুম্বিবে প্রণয়-উষ্ণ সুদীর্ঘ চুম্বনে?
আসন্ন সমরক্ষেত্রে, নশ্বর সমরে,
প্রহারিবে যবে অরি অসি উগ্রতর,—
দেখিবে সে মুখচন্দ্র। মধ্যাহ্ন-ভাস্করে
জিনি, তোপ-বিনিঃসৃত গোলা ভয়ংকর
আসিবে হুংকারি যবে, দেখিয়া তখন
সে মুখ সজলশশী, ত্যজিবে জীবন।

৮

আবার কোথায় কাঁদে বিকল অন্তরে
অভাগা জনক, স্মরি অপত্য-মমতা।
আর কি লইবে কোলে, চুম্বিবে আদরে,
সুবর্ণকুসুম পুত্র, কন্যা স্বর্ণলতা?
কেহ বা ভাবিয়া বৃদ্ধ জনক-জননী
কাঁদিছে নীরবে দুঃখে, আনায়-মাঝার
কুরঙ্গশাবক কাঁদে নীরবে যেমনি,
ভাবি অবিলম্বে হবে ব্যাধের আহার।
এইরূপে মনোভাব কুসুম-কোমল,
গঙ্গাতীরে, নীরে, ফুটে ঝরে অবিরল।

৯

শ্বেতদ্বীপ-সুত কেহ ভাবিয়া স্বদেশ—
বীরত্বের রঙ্গভূমি, ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার,
স্বাধীনতা-চিরবাস, গৌরবে দিনেশ,
সভ্যতার-সুশিক্ষার-উন্নতির আধার,—

হায় রে পূর্ব্বের রবি গিয়াছে পশ্চিমে!
অধীর স্মৃতির অস্ত্রে; ভাবে মনে-মনে,
দেখিবে সে জন্মভূমি আর কতদিনে।
দেখিবে কি পুনঃ আহা! এ মরজীবনে?
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবি শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া,
অধীর বিচ্ছেদ-বাণে, ফাটে বীর হিয়া!

১০

কেহ বা ভাবিছে এই আসন্ন সমরে
কীর্ত্তির কিরীট-রত্ন লভিবে অচিরে;
কেহ ভাবে পদোন্নতি; কেহ অর্থতরে,
আকাশ করিছে পূর্ণ সুবর্ণ মন্দিরে।
কেহ বা কল্পনা-বলে বধিয়া নবাবে,
বিজয়-পতাকা তুলি কোষাগারে
লুটিতেছে ধনজাল; কল্পনা-প্রভাবে
লুণ্ঠন করিয়া শেষ, ষোড়শোপচারে
পূজিতেছে প্রণয়িনী কোন্ বীরবর,
সুবর্ণে সৃজিয়া হর্ম্ম্য অতি-মনোহর।

১১

ধন্য আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ, প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

১২

ধন্য, আশা কুহকিনী! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষৎ-অন্ধ মূঢ় মানব-সকল

ঘুরিতেছে কর্মক্ষেত্রে বর্তুল আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।

১৩

ওই যে কাঙাল বসি রাজপথ-ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্তি!—কঙ্কাল শরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নার।
ভিক্ষা করি দ্বারে-দ্বারে এ তিনপ্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্বাপিত; রুগ্ন কলেবর;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

১৪

ধর্মাধিকরণে বসি নিম্ন কর্মচারী,
উদরে জঠর-জ্বালা, গুরু কার্যভারে
অবনত মুখ,—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র-সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে।
যথা শালবৃক্ষ করে গিরি-শিরোপরে
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়
নীল সিন্ধু-সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।
ঘর্ম-সহ অশ্রুবিন্দু বহে দর-দর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

১৫

না জানি কি ভবিষ্যৎ, আশা মায়াবিনী!
চিত্রিলে নয়নে তার; মুছি ঘর্মজল,
মুছি অশ্রুজল পুনঃ লইয়া লেখনী,
আরম্ভিল মসীযুদ্ধ হইয়া সবল।
নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,

নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি—"না ছাড়িব আশা।"

১৬

যথা যবে বহে বেগে ভীম প্রভঞ্জন,
সামান্য সরসীনীর হয় হিল্লোলিত;
আসন্ন আহবে ক্ষুদ্র পদাতিক মন
করেছে তেমতি হায় আজি উচ্ছ্বসিত।
কিম্বা সৌর কর যথা মুকুটরতন
রচি ইন্দ্রচাপে, রঞ্জে নীল কাদম্বিনী;
তেমনি সৈন্যের ম্লান বিষাদিত মন
ছলে দুরাকাঙ্ক্ষা চিত্রে, আশা মায়াবিনী।
হয় যদি ইহাদের দুরাশা পূরণ,
কত পর্ণগৃহ হবে রাজাব ভবন।

১৭

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি!
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি?
বঙ্গ ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি!
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বলো কুহকিনী!
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

১৮

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে,
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য-ধনে
সজ্জিত যে বরবপু? কিম্বা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে! তোমার মায়ায়
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদচ্ছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর-ধরায়।

অতএব দয়াকরি কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি?

১৯

শিবির অনতিদূরে, বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব, মগ্ন গভীর চিন্তায়।
গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু বদনমণ্ডলে
নাহি সুরূপের চিহ্ন; মনোহারিতায়
নাহি রঞ্জে শ্বেত-কান্তি; অথচ যুবার
সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়। প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত সুদৃঢ়, বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহস স্রোতঃ ভয়ংকর।

২০

যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময়; অন্তর্ভেদী তীব্র দৃষ্টি তার
স্থির, অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল,
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতি—বরষে গরল
শত্রুর হৃদয়ে; কিন্তু কখন আবার,
সে নেত্রনীলিমা, নীল নরকাগ্নি মতো,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।

২১

নীরবে, নির্জনে, বীর বসি তরুতলে;—
অর্থহীন ঊর্ধ্বদৃষ্টি। বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে, দূর-ভবিষ্যৎ
নিরখিতে। নিরখিতে,—যেই দুরাচার
দুরন্ত যুবক দুষ্প্রবৃত্তি-রত,
নির্ভয় হৃদয় সদা, পিতা-মাতা যার

পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে,
অথবা মরিতে দূরে মাদ্রাজের জ্বরে,—

২২

নিরখিতে অদৃষ্টে সে অভাগা যুবার
আর কি লিখেছে বিধি; করিবে দর্শন
অদৃষ্টচক্রের কত আবর্তন আর।
মধ্যাহ্ন-রবির জ্যোতি করিয়া হরণ,
জ্বলিতেছে দু-নয়ন; তাহে রূপান্তর
হইতেছে মুহুর্মুহু; আরক্ত এখন
ব্রিটিশ-সুলভ-রাগে; মুহূর্তেক পর,
করিল বিষাদে যেন ঘন আচ্ছাদন।
কভু ক্রোধে বিস্ফারিত, চিন্তায় কুঞ্চিত,
কখন করুণ-রসে হতেছে আর্দ্রিত।

২৩

নীরবে ভাবিছে বীর,—হায় উপেক্ষিয়া
সমগ্র সমর-সভা, নিষেধ সবার,
অণুমাত্র ভবিষ্যৎ মনে না ভাবিয়া,
দিলাম একাকী রণ-সমুদ্রে সাঁতার।
যদি ডুবি, একা নহি, ডুবিবে সকল
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত;
ডুবিবে ব্রিটিশ রাজ্য, যাবে রসাতল;
ব্রিটিশ-গৌরব-রবি হবে অন্তর্হিত।
যদি ভীম ভূকম্পনে ভাঙে শৃঙ্গবর,
পড়ে তরু-গুল্ম-হর্ম্য-সহিত শিখর।

২৪

"একই ভরসা মির জাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু-প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন্ মতে? যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া।
যেই মহামন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছি তারে
যদি সে জানিতে পারে, ক্রোধে গরজিয়া
একই নিশ্বাসে পাপী নাশিবে সবারে।
নর-রক্তে সন্ধিপত্র হবে প্রক্ষালিত,
অন্ধকূপ-হত্যা পুনঃ হবে অভিনীত।

২৫

"যদি প্রতারণা মির জাফরের মনে
থাকে,—এখনও নাহি চিহ্নমাত্র তার—
যদি এই সন্ধি মির জাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি,
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে;
তবেই তো বিপদের না রবে অবধি,
পড়িব পতঙ্গ যেন অনল-ভিতরে।
এই স্বল্প সেনা লয়ে কি হইবে তবে,
ভেলায় ভরসা করি ভাসিয়া অর্ণবে?

২৬

"শুধু পরাজয় নহে; তাহার কারণ
নাহি ভাবি, নাহি ডরি কালের কবল;—
লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,
মৃত্যু তো আমার পক্ষে নিয়তি কেবল'
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙলার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিবে অতল জলে; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলন্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।
শত্রুশ্রেষ্ঠ ধরাতলে পতিত দেখিয়া,
দক্ষিণে ফরাসি-সিংহ উঠিবে গর্জিয়া।

২৭

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন,
কি হবে ভাবিয়া এবে? কে কবে ভাবিয়া
আজি জানিয়াছে, কালি কি হবে ঘটন?
যা আছে অদৃষ্টে, আর দেখি পরীক্ষিয়া।
দুই বার যমদণ্ড হানি শিরোপরে
নিজ হস্তে না মরিনু; না মরিনু হায়!
অব্যর্থ-সন্ধানী সেই সৈনিকের করে;
মরিতে কি অবশেষে—বুক ফেটে যায়!—
নরাধম কাপুরুষ যবনের করে?
মরিলেও এই দুঃখ থাকিবে অন্তরে।

২৮

"সেইদিন প্রভঞ্জন-পৃষ্ঠে আরোহিয়া,
পশিনু সাহসে যবে আর্কট নগরে;
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়ে উপেক্ষিয়া,
পশিনু বিদ্যুৎবেগে দুর্গের ভিতরে।
বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে দুর্গবাসীগণ
পলাইল বিনা যুদ্ধে;—কুরঙ্গ যেমতি
যূথমধ্যে ক্রুদ্ধ সিংহ করি দরশন;—
মুহূর্তেকে হইলাম দুর্গ-অধিপতি।
সেইদিন বজ্র নাহি পড়িল মাথায়;
শত্রুর কৃপাণ নাহি পশিল গলায়।

২৯

"কিম্বা পঞ্চাশৎ দিন আক্রমণ পরে,
—স্মরিলে সে কথা, রক্তে বিদ্যুৎ খেলায়-
হোসেনের মৃত্যুদিন উপলক্ষ করে,
উন্মত্ত যবন-সৈন্য করিয়া সহায়,
পশিল কর্ণাটরাজ নিশীথ সমরে।
পঞ্চশত সৈন্যে, দশ সহস্র সেনায়
বিমুখিনু সেইদিন, তুলিনু বিমানে
ব্রিটিশের সিংহনাদ কাঁপায়ে 'রাজা'য়;
মরিতে কি এই ভীরু নবাবের করে?
না—তা নয়! আছে মম এই হস্তোপরে।

৩০

"অন্ধকূপহত্যা প্রতিবিধানের ভার;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ্-গৌরব
দণ্ডিয়া নবাবে। হেন উদ্দেশ্য যাহার,
তার কাছে কি অসাধ্য, কিবা অসম্ভব?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর;
অবশ্য সিরাজদ্দৌলা পাবে প্রতিফল;
'হও অগ্রসর, রণে হও অগ্রসর'—
আমার অন্তর-আত্মা কহিছে কেবল।
না জানি কি মহাশক্তি অন্তরে আমার
আবির্ভূত আজি, আমি ইঙ্গিতে তাহার।

৩১

"চলিতেছি ইচ্ছাধীন পুতুলের প্রায়।"
বলিতে-বলিতে বীর, ত্যজিয়া আসন

ভ্রমিতে লাগিলা দ্রুত, নিরখি ধরায়;
ভূতল ভেদিয়া যেন যুগল নয়ন
গিয়াছে কোথায়, ধরা দেখা নাহি যায়।
কল্পনা-তাড়িত পক্ষে মানস চঞ্চল,
অতিক্রমি নীল সিন্ধু লহরীমালায়,
বিরাজে ইংলণ্ডে কভু; ভাবী রণস্থল
চিত্রে কভু; সেই চিত্রে হৃদয়ে তাঁহার
কত আশা, কত ভয়, হতেছে সঞ্চার।

৩২

চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে;
অকস্মাৎ চারিদিকে ভাসিল সত্বরে
স্বর্গীয় সৌরভরাশি; বাজিল গগনে
কোমল-কুসুম-বাদ্য,—সংগীত তরল;
সহস্র ভাস্কর তেজে গগন-প্রাঙ্গণ
ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন।
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব রমণী।

৩৩

যুবতীর শুভ্র কান্তি, নয়ন-নীলিমা,
রঞ্জিত ত্রিদিব-রাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরীরূপ, অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন্ নর-চিত্রকর?
শ্বেতাঙ্গ সজ্জিত শ্বেত-উজ্জ্বল বসনে,
খেলিছে বিজলি, বস্ত্র অমল-ধবলে;
তুচ্ছ করি মণিমুক্তা পার্থিব রতনে,
ঝলসে নক্ষত্ররাজি বসন-অঞ্চলে।
বেশ-ভূষা ইংলণ্ডীয় ললনার মতো,
স্বর্গীয় শোভায় কিন্তু উজ্জ্বল সতত।

৩৪

অর্ধ-অনাবৃত পীন-পূর্ণ-পয়োধর;
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক-আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর,—

চিরপ্রসন্নতাময়, প্রতিপারাবার।
নহে, উপমেয় সেই বদনচন্দ্রমা,
—কিম্বা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে-
স্বর্গীয় শারদ-শশী সে মুখ-সুষমা;—
বিশ্ববিমোহিণী আহা! অতুলিতা ভবে।
বসন্তরূপিনী ধনী; নিশ্বাস মলয়;
কোকিল-কোমল কণ্ঠ; নেত্র কুবলয়।

৩৫

কোটি কোহিনুর-কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে
কনক-অলকাবলী-বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব খচিত চারুকুসুম রতনে,—
চির-বিকশিত পুষ্প, চির-সুবাসিত।
বামার সুরভি-শ্বাস, কুসুম-সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

৩৬

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলংকৃত, জ্যোতিই সকল;
জ্বলিছে-হাসিছে জ্যোতি চিরপ্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতি, জিনি মধ্যাহ্ন-তপন;
অথচ শীতল যেন শারদ-চন্দ্রিমা;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমনি অমৃতমাখা পূর্ণ-মধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্তি দেখিলা নয়নে!

৩৭

বিস্মিত ক্লাইবে চাহি সস্মিত বদনে,
আরম্ভিলা সুরবালা—"কি ভয় বাছনি?"—
রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্ন-পবনে
বহিল উল্লাসে মাতি, সেই কণ্ঠধ্বনি

শুনিতে জাহ্নবীজল বহিল উজান,
অচল হইল রবি অস্তাচল-শিরে
মুহূর্ত করিতে সেই স্বরসুধা পান।
সঞ্জীবনী সুধারাশি সমস্ত শরীরে
প্রবেশিল ক্লাইবের, বহিল সে ধ্বনি
আনন্দে ধমনী-স্রোতে; বাজিল অমনি।

৩৮

মথ হৃদয়ের যন্ত্রে—কি ভয় বাছনি?
ইংলন্ডের রাজলক্ষ্মী আমি, সুভাগিনী,
লক্ষ্মী কুললক্ষ্মী আমি, শুনো বীরমণি।
রাজলক্ষ্মী-মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আদরিণী
বিধাতার; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে
আমি চিরগৌরবিণী। ত্রিদিবে বসিয়া
কটাক্ষে জানিতে আমি পারি এই ভবে
কখন কি ঘটে; দেখি অদৃশ্যে থাকিয়া
পার্থিব ঘটনাস্রোত; চিন্তি অনিবার
ইংলন্ডের রাজ্যস্থিতি, উন্নতি, বিস্তার।

৩৯

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন,
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে বাছনি!
শুনাইতে ভবিষ্যৎ বিধির লিখন;—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি!
এই হতে ইংলন্ডের উন্নতি নিয়তি;
এই সমুদিত মাত্র সৌভাগ্য-ভাস্কর।
মধ্যাহ্ন-গৌরবে যবে ব্রিটেন-ভূপতি
উজলিবে দশদিক্, দেশ-দেশান্তর,
তাঁর ছত্র-ছায়াতলে, জানিবে নিশ্চিত,
অর্ধ-সসাগরা ধরা হবে আচ্ছাদিত।

৪০

"সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসি দুর্জয়
করিবে না রক্তপাত; দ্বিতীয় বাবর,
ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন।

কিম্বা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি-কান্তার,
দিল্লির ভাণ্ডাররাশি করিতে লুণ্ঠন,
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর।
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত-প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব অধ্যায়।

৪১

"অজ্ঞাতে ভারতক্ষেত্রে কিছুদিন পরে
যেই মহাশক্তি, বাছা, করিবে প্রবেশ,
মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দিল্লির ঈশ্বরে।
তেয়াগিয়া রঙ্গভূমি, ছাড়ি রণবেশ
ভয়ে মহারাষ্ট্র-সিংহ পশিবে বিবরে।
যেমতি প্রভাত-রবি ভেদিয়া তুষার
যতই উঠিতে থাকে গগন-উপরে,
ততোই পাদপছায়া হয় খর্বাকার,
তেমতি এ শক্তি যত হইবে প্রবল,
ভারতে ফরাসি ততো হবে হতবল।

৪২

"তুমি সে শক্তির মূল, আদি অবতার।
হইও না চমৎকৃত, ভেবো না বিস্ময়,
ভারত অদৃষ্টচক্র, কৃপাণে তোমার
সমর্পিত; যেইদিকে তব ইচ্ছা হয়,
ঘুরিবে-ফিরিবে চক্র তব ইচ্ছামতো।
বঙ্গে যেই ভিত্তি তুমি করিবে স্থাপন,
সময়েতে তদুপরি ব্যাপিয়া ভারত
অটল-অচল রাজ্য ছাইবে গগন।
বিধির মন্দির হতে আনিয়াছি আমি
ভারতবর্ষের ভাবী মানচিত্রখানি।

৪৩

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখো উর্ধ্বশিরে পরশে গগন;—
অদ্রির উপরে অদ্রি, অদ্রি তদুপরে;
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ।
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
উর্মির উপরে উর্মি, উর্মি তদুপরে,—

হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তক দেখো ভেদি নীলাম্বরে।
অচল পর্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চঞ্চল অচলরাশি ভাসে সিন্ধুপরে।

৪৪

"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব সীমানায়;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে;
মধ্যদেশে, ওই দেখো, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটেন নাহি হবে সমতুল।
তথাপি হইবে—আর নাহি বহুদিন,
অভাগিনী-প্রতি বিধি চির-প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র ব্রিটেন-অধীন।
বিধির নির্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোমরাজ্য এখন কোথায়?

৪৫

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথীতীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটিরে,
শোভিবে অমরাবতীরূপে করি গ্লানি
রাজ-হর্ম্যে, দৃঢ়দুর্গে, আলোকমালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা-শিরে
ব্রিটিশ-পতাকা, যেন গৌরবে-হেলায়
খেলিছে পবন-সনে অতি ধীরে-ধীরে;
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্য করিবে স্থাপন।

৪৬

"নব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্নসিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়।
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মতো।
তোমার নিশ্বাসে এই ভারত-ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত-উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে সমরে।

প্রণমিবে হিমাচল-সহিত সাগর,—
'ইংলন্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।'

৪৭

"শতেক বৎসর রাজবিপ্লবের পরে
ইংলন্ডের সিংহাসন হইবে অচল;
উদিবে যে তীব্র রবি ভারত-অম্বরে
ভাতিবে ধবলগিরি, সমুদ্রের তল।
কঙ্কালবিশিষ্ট পূর্ব নৃপতি-সকল
ঘুরিবে বেষ্টিয়া, সৌর উপগ্রহ-মতো;
আশু রাহুগ্রস্ত হয়ে দুর্দান্ত মোগল,
ছায়া কিম্বা স্বপ্নে শেষে হবে পরিণত।
বিক্রমে শার্দূল-মেষ, অহিংস অন্তরে,
নির্ভয়ে করিবে পান একই নির্ঝরে।

৪৮

"ধরো বৎস! এই ন্যায়পরতা-দর্পণ
বিধিকৃত, ব্রিটিশের রাজ্য-নিদর্শন!
যতদিন পূর্বরাজ্যে ব্রিটিশ-শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতি বিশদ এমন,
ততোদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহা-রাজনীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে নিরয়;
এই পাপে কত রাজ্য হয়েছে পতন!
ভীষণ সংহার-অসি রাজ্যের উপরে
ঝোলে সূক্ষ্ম ন্যায়-সূত্রে বিধাতার করে।

৪৯

"যবনের অত্যাচার সহিতে না পারি
হতভাগ্য বঙ্গবাসী—চিরপরাধীন—
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী,
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন,
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে,
শান্তির শারদ-শশী করিতে স্থাপন।
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে
উদিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিশ-তপন।
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দয়,
ডুবিবে ব্রিটিশ-রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয়।

৫০

"রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর,
জেতার উপরে জেতা, জিতের সহায়;
আছেন উপরে বৎস, অতি-ভয়ংকর!
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্তিমান ন্যায়।
তাঁর রবি-শশী-তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্ত ধনী ও নির্ধনে;
সমভাবে, সর্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল;
সম্মুখে ভীষণ বৎস, গণনার স্থল।"

৫১

অদৃশ্য হইলা বামা; পড়িল অর্গল
ত্রিদিব-কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের; গেল স্বর্গ, এল ধরাতল।
হায়! যথা হতভাগ্য জলমগ্ন-জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে সলিল-ভিতরে
শত-শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি-রাশি, নিরখিয়া, মুহূর্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখে বিশ্ব আঁধার কেবল;
অন্তর-নয়নে বীর ব্রিটেননন্দন
স্বপ্নান্তে আঁধার বিশ্ব দেখিলা তেমন।

৫২

ভাঙিল বিস্ময়-স্বপ্ন; মেলিয়া নয়ন।
নাহি সে আলোকরাশি, নাহি বিদ্যমান
আলোকমণ্ডিত সেই রমণীরতন,—
নির্মল আলোকে শ্বেতভুজা অধিষ্ঠান।
স্বর্গীয় সৌরভ আর না বহে পবনে ;
স্বর্গীয় সংগীত-সুধা না হয় বর্ষণ ;
আর সেই মানচিত্র না দেখে নয়নে,
মুষ্টিবদ্ধ করে আর নাহি সে দর্পণ।
থাকে না তা নর-করে, থাকিলে কি আর
স্বার্থের সমরক্ষেত্র হইত সংসার?

৫৩

"সেনাপতি! ভাগীরথী-তীর অতিক্রমি,
আজ্ঞা-অপেক্ষায় সৈন্য আছে দাঁড়াইয়া;
বেলা অবসান-প্রায়, অস্ত দিনমণি—"
বলিল জনৈক সৈন্য। চমকি উঠিয়া
ছুটিলা ক্লাইব বেগে, নাহি কিছু জ্ঞান
কোথায় পড়িছে পদ, শূন্যে কি ধবায়।
মানসিক শক্তিচয় যেন তিরোধান
হয়েছে রমণী-সনে। দৈববাণী-প্রায়
এখনো গম্ভীরে কর্ণে বাজিছে কেবল,—
"সম্মুখে ভীষণ বৎস! গণনার স্থল।"

৫৪

সজ্জিতা তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল,
স্থির ভাগীরথী-জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি ব্রিটিশ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,
তালে-তালে দাঁড়ি দাঁড়ে পাড়িতে লাগিল;
আঘাতে-আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশিখানি ভাঙিল-গড়িল!
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিশ-তনয়
গায়—"জয়-জয়-জয়, ব্রিটিশের জয়!"

গীত

১

চির-স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে,
নিস্তাবা আকাশে যেন নিশামণি,
সুখে ব্রিটনিয়া আনন্দে বিহরে,
বীরপ্রসবিনী ব্রিটিশজননী।
যেই নীল সিন্ধু অসীম দুর্জয়,
বিক্রমে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন,
ব্রিটেনের কাছে মানি পরাজয়,
সেই সিন্ধু চুম্বে ব্রিটন-চরণ।
ঘোষে সেই সিন্ধু করি দিগ্বিজয়,—
"জয়-জয়-জয়, ব্রিটিশের জয়।"

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি
অভয়ে আমরা ব্রিটন-নন্দন,
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশদেশান্তরে করি বিচরণ।
নব-আবিষ্কৃত আমেরিকা-দেশে,
কিম্বা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলন্ডের কীর্তি না আছে কোথায়?
পূরব, পশ্চিম, গায় সমুদয়,—
"জয়-জয়-জয়, ব্রিটিশের জয়!"

৩

সম্পদ-সাহস; সঙ্গী তরবার;
সমুদ্র বাহন; নক্ষত্র কাণ্ডারী;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার;
শয্যা রণক্ষেত্র; ঈশা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানল-সম বিক্রম বিস্তার;
আছে কোন্ দুর্গ, কোন্ অদ্রিপতি,
কোন্ নদ, নদী, ভীম পারাবার
শুনিয়া সভয় কম্পিত না হয়,—
"জয়-জয়-জয়, ব্রিটিশের জয়!"

৪

আকাশের তলে এমন কি আছে
ডরে যারে বীর ব্রিটিশ-তনয়?
কেবল ব্রিটিশ-ললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয়।
বীরবিনোদিনী সেই বামাগণে
স্মরিয়া অন্তরে, চলো রণে তবে!
হায়! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্তা বামাগণে যবে
গাবে বামাকণ্ঠস্বর করি লয়,—
"জয়-জয়-জয়, ব্রিটিশের জয়!"

৫

দাও তবে সবে অভয় অন্তরে,
বারি বিদারিয়া দাও দাঁড়ে টান!
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাহি ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক-কামান।
ব্রিটিশের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্ধপথে রয়।
কি ছার দুর্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয়।
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,—
"জয়! জয়! জয়! ব্রিটিশের জয়'

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত

সুগন্ধ তুষার-বারি, নয়নে, বদনে,
তুষার উরস শ্বেতে, সহচরীদ্বয়
বরষিল; কিছুক্ষণ পরে রূপসীর
অচল হৃদয়-যন্ত্র, জীবন-পবন—
স্পর্শে চলিল আবার, খুলিল নয়ন,—
প্রভাতে দক্ষিণানিল কমল পরশে,
উন্মেষিল যেন ধীরে কোমলের দল।
অর্ধ-উন্মীলিত নেত্র, একদৃষ্টে চাহি
কক্ষে বিলম্বিত এক চারু-চিত্র-পানে,
বলিতে লাগিল বামা—"ওই, সহচরী!
ওই যে দেখিছ চিত্র,—নিসর্গ-দর্পণ!—
অপূর্ব অঙ্কিত! ওই দেখো ওই,
'চিদনস'*-স্রোতে ওই প্রমোদ-তরণী,
ভাসিতেছে, নাচিতেছে, বারিবিহারিণী।
হাসিতেছে, জ্বলিতেছে পশ্চিম-তপনে,
প্রতিবিম্বে ঝলসিয়া তরল সলিল।
ময়ূর-ময়ূরী প্রেমে মুখে মুখ দিয়া,
বঙ্কিম গ্রীবায় ভাসে তরী-পুরোভাগে;
চন্দ্রক কলাপরাশি—নয়ন-রঞ্জন!—
চারু-চন্দ্রাতপরূপে শোভিছে পশ্চাতে।
তাহার ছায়ায় বসি কর্ণিকা রূপসী;
নাচে স্বর্ণ কর্ণ, বদ্ধ কুসুম-মালায়
কুসুম কোমল করে। বসন্ত রঙ্গের
নাচিতেচে সুবাসিত সুন্দর কেতন,
সৌরভে-মোহিত-মৃদু অনিল-চুম্বনে।
তরণীর মধ্যদেশে, সুবর্ণ-খচিত
চন্দ্রাতপ-তলে, স্বর্ণ-কমল-আসনে,
বারুণী-রূপিণী, ওই তরণী-ঈশ্বরী;
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর!

* 'চিদনস' নামক নদ—এশিয়া মাইনরে।

দুইপাশে সুকুমার কিঙ্কর-নিচয়
দাঁড়ায়ে মন্মথবেশে, সস্মিত বদন,
বজনিছে ধীরে-ধীরে বিচিত্র ব্যজনে।
কিন্তু সে অনিলে কই জুড়াবে বামায়,
বরং হইতেছিল কোমল পরশে,
কাল-লালসায় উষ্ণ কপোল-যুগল।
সম্মুখে অঙ্গনাগণ, অনঙ্গ-মোহিনী,
কোমল মদনোন্মাদ সংগীত তবল
বর্ষিতেছে নানা যন্ত্রে; তালে-তালে তাব
পড়িছে রজত দাঁড় রজত সলিলে;
তরণী সুন্দরী, ভুজ-মৃণালেতে যেন,
আলিঙ্গিছে প্রেমাহ্লাদে নদ 'চিদনসে'।
সে সুখ-পরশে নাচি স্রোত হিল্লোলিয়া,
প্রেম-মুগ্ধ ছুটিতেছে তরণী পশ্চাতে।
নাচিছে তরণী;—মরি! সেই নৃত্য, সেই
সলিলের ক্রীড়া, সখি! দেখো চিত্রকর
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে! নাচিতে-নাচিতে
চুম্বিয়া সরিৎ-বক্ষ, কহি কানে-কানে
অস্ফুট প্রণয়-কথা তর-তর স্বরে,
চলেছে রঙ্গিণী ওই, মৃদুল-মৃদুল
সৌরভে করিয়া, মরি! ইন্দ্রিয় অবশ!
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শক-মালায়,
সাজায়েছে দুই তীর। উচ্চ সিংহাসনে
অদূরে নগরে বসি একাকী এন্টনি,
ডাকিছে অস্ফুট শিসে অপহৃত মন।
কিন্তু সখি! তৃষ্ণাতুর সহস্র নয়ন,
যেরূপ-সুধাংশু-অংশু করিতেছে পান
কে ওই রমণী,—সর্বদর্শক-দর্শন?
ক্লিওপেট্রা? আমি? না, না, সখি! অসম্ভব!
সেই যদি ক্লিওপেট্রা, আমি তবে নহি।
আমি যদি ক্লিওপেট্রা, তরী-বিহারিণী
ওই চিত্র, নহে সখি! আমি দুঃখিনীর।
সেই মুখে হাসি-রাশি, এ মুখে বিষাদ;
সে হৃদয়ে সুখ, সখি! এ হৃদয়ে শোক।
সে যে ভাসিতেছে সুখে প্রণয়-সলিলে,
আমি ডুবিয়াছি হায়! নিরাশা-সাগরে।
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি!

শোভিতেছে মরি! যেন শারদ-কৌমুদী
বেষ্টিয়া কুসুম-বন, আজিও সে বেশে
সজ্জিত এ বপু মম; কিন্তু সহচরি!
সেই শোভা—এই শোভা—কতই অন্তর!
আজি সেই বেশ, স্বর্ণ-হীরক-খচিত,
নিবিড় তমিস্র যেন সমাধি বেষ্টিয়া!
সে দান প্রেমের শুক্ল-দ্বিতীয়া আমার,
আজি হায়! নিরাশার কৃষ্ণা চতুর্দশী!
নীরবিল ধীরে বামা; মধুর বাঁশরি
গাইয়া বিষাদ-তান, নীরবে যেমতি।
স্থির-নেত্রে কিছুক্ষণ চাহি শূন্য-পানে,
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা;—
"চলিল তরণী বেগে, চলিলাম আমি
ভেটিতে এন্টনি, সখি! করিতে অর্পণ
বালিকার চিত্ত-চোরে, যুবতী-যৌবন।
যত অগ্রসর তরী হতেছিল বেগে,
ততোই হইতেছিল মানস আমার
সঙ্কুচিত,—নির্ঝরিণী-মুখে যথা নদ
'চিদনস'। হায়! সখি, ভাবিতেছিলাম
কি আছে অদৃষ্টে মম,—প্রেম-সিংহাসন,
কিম্বা রোম-কারাগার! দেখিতে-দেখিতে
সঙ্কুচিত আশা-স্রোত প্রণয়-নির্ঝরে
পাইলাম, কিন্তু সখি! সেই সম্মিলনে
উথলিল যেই ঢল প্রেম-প্রস্রবণে—
হৃদয়-প্লাবিনী! সেই সলিল-প্রবাহে
ভেসে গেল মম কুল, শীল, লজ্জা, ভয়;
ভেসে গেল সেই বেগে ভূত, ভবিষ্যৎ,
বর্ত্তমান উভয়ের; হইল চঞ্চল
বেগে, রোম, মিশরের, রাজ-সিংহাসন;
ভেসে গেল সেই স্রোতে সপত্নী 'সিল্‌ভিয়া'।*
ভাসিয়া-ভাসিয়া সেই প্রণয়-প্লাবনে
আসিলাম মিশরেতে, প্লাবন-প্রবাহ
সখি! মিশিল সাগরে। স্বজনি! তখন
সকলি অনন্ত! হায়, অনন্ত প্রেমের
অনন্ত লহরী-লীলা! অনন্ত আমোদ
বিরাজিত নিরন্তর অধরে, নয়নে!

---

* এন্টনির প্রথমা পত্নী

অনন্ত, অতৃপ্ত সুখ যুগল-হৃদয়ে!
ভাবিলাম মনে—প্রেম, সুখ, রাজ্য, ধন,
প্রেমিক-জীবন, হায়! অনন্ত সকল!
যে কাম-সরসী, সখি! করিনু নির্মাণ,
যত পান করি, বাড়ে প্রণয়-পিপাসা;—
অনন্ত পিপাসাতুর নায়ক আমার!
ঢালিয়া দিলাম তাহে জীবন-যৌবন
মম, ঝাঁপ দিল রাজহংস উন্মত্তের-
প্রায়,—মদন-বিহ্বল! সেই সরোবরে
কভু মৃণালিনী আমি, সখা মধুকর;
আমি মরালিনী, সখা মরাল সুন্দর।
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সলিলে
সখা মদমত্ত করী; সলিলের তলে
কভু আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি;—
অধিপতি ক্লিওপেট্রা কাম-সরসীর!
এইরূপে, এই সুখে, গেল দিন, গেল
মাস, চলিল বৎসর, বিজলি-ঝলকে,—
অনঙ্গ-বিলাসে, সুরা, সংগীত বিহ্বল!
"একদিন নিজ কক্ষে বসিয়াছি আমি,
মদালসে! শ্লথ দেহ, নিশি-জাগরণে,
অবশ পড়িয়া আছে কোমল 'ছোফা'য়।
কখন পড়িতেছিনু; কভু অন্য মনে
গাইতেছিলাম গীত গুন-গুন স্বরে,—
প্রেমময়,—নব-রাগে, নব-অনুরাগে,
নিরখি অসাবধানে শায়িত শরীর,
প্রতিকূল দেয়ালের দীর্ঘ আরশিতে।
শিথিল হৃদয়-যন্ত্রে, কভু চারমিয়ন্।
মধুরে বাজিতেছিল আনন্দ-সংগীত;
আবার অজ্ঞাতে সখি! না জানি কেমনে
বিষাদ ভাঙিতেছিল সে লয় মধুর।
কখন হাসিতেছিনু, না জানি কারণ;
আবার অজ্ঞাতে অশ্রু নয়নে কখন
হঠাৎ আসিতেছিল, না জানি কেমনে।
একটি মানব-ছায়া এমন সময়ে,
পতিত হইল সখি! কক্ষ-গালিচায়?
পলকে ফিরাতে নেত্র দেখিলাম চক্ষে
প্রাণেশ আমার! কিন্তু সেই মূর্তি! যেই

মূর্তি, অন্যদিন কক্ষে প্রবেশিতে মম,
বিকাশিত প্রেমানন্দ, ললাটে, নয়নে;
হাসিরূপে সমুজ্জ্বল করিতে অধরে;
নিঃসারিত সম্ভাষিতে,—'কই গো কোথায়
প্রাচীনা নীলজ* চারু ফণিনী আমার?'
সেই মূর্তি আজি দেখি গাম্ভীর্য-আধার,
কাঁপিল হৃদয় মম।—'ক্লিওপেট্রা! এই
দুঃসময় ঘেরিতেছে জলধররূপে,
চারিদিকে এন্টনির অদৃষ্ট-আকাশ।
যদি এ সময়ে, নাহি উড়াই তাহারে,
হইবে অসাধ্য পরে। রোম হতে আজি
কুসংবাদ; আন্তরিক-বিগ্রহ-কৃপাণে
'ইতালি' কণ্টকাকীর্ণ। কৃপাণ-জিহ্বায়
প্রতিবিম্বে রবিকর নির্ভয়ে দিবসে,
উপহাসি এন্টনির বিলাস-জীবন।
প্রেয়সি! বিদায় তবে কিছুদিন-তরে
দাও যাই, কটাক্ষে সে কৃপাণ-সকল
ছিন্ন শস্যরাশিমত, আসি শোয়াইয়া।
আসি ডুবাইয়া নেত্র-নিমেষে 'পম্পি'র
জলযুদ্ধ-সাধ; সেই সমুদ্রের জলে;—
পিতার অন্তিমশয্যা প্রদানি পুত্রেরে!**
দাও অনুমতি তবে। ঈর্ষার অনল
জ্বলে থাকে যদি তব রমণী-হৃদয়ে,
নিবাও তাহারে, শুনো দ্বিতীয় সংবাদ—
মরেছে 'ফুল্‌ভিয়া' আমার—
মরেছে!—
'ফুল্‌ভিয়া'।
কি? মরেছে 'ফুলভিয়া'!
'হাঁ, মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।
দংশেছিল এন্টনির বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ
যেই নালে, সেই নালে 'মরেছে ফুল্‌ভিয়া'।
এ সম্বাদে, চারমিয়ন্‌! অমৃত ঢালিল।
এই মুক্তাহার নাথ পরাইয়া গলে,
বলিলেন,—'এই হারে যত মুক্তা প্রিয়ে!

---

* নীল নদীজাত।

** পম্পির পিতা সমুদ্রতীরে মিশর বাসীদের দ্বারা হত হয়েছিলেন।

ইতালির রণজয় করিতে প্রচার,
ততো রাজ্যে সাজাইব মুকুট তোমার,
কল্যাণি! অন্যথা এই তরবারি মম,
বিসর্জ্জি আসিব ওই ভূমধ্য-সাগরে।
প্রেয়সি! বিদায় দাও যাইব এখন।
মিশরে থাকিবে তুমি, কিন্তু ছায়া তব
যেতেছি লইয়া মম ছায়াতে মিশায়ে;
বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাখিয়া
তব সহচর সদা',—
ধরিয়া গলায়,
উন্মত্তের প্রায় সখি! কত কাঁদিলাম,
কত বলিলাম—'নাথ! নাহি চাহি আমি
রাজ্যধন; মুহূর্তের ভালোবাসা তব,
শত-শত রাজ্যে কিম্বা সমস্ত ধরায়
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা। পৃথিবী কি ছার!
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ তোমার
প্রণয়-রাজ্যের রানী যেই সুভাগিনী'।
কত কাঁদিলাম, সখি! কত বলিলাম,
কত শুনিলাম, কিন্তু বিফল সকল!
রণোন্মত্ত কেশরীবে, কেমনে স্বজনি!
রমণী-বীতংস বল, রাখিবে বাঁধিয়া?
ফুটিল অধরে উষ্ণ-কোমল চুম্বন
বিদ্যুতের মতো,—সখি! নাহি জানি আর।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখী,—
হায়! সেই বিধু আজি নিবিড় জলদে
আচ্ছাদিত,—আরম্ভিল,—"পাইলাম জ্ঞান
যবে ওলো চারমিয়ন্! নাহি পাইলাম
আর হৃদয় আমার। নাহি দেখিলাম
চাহি আকাশের পানে, রবি-শশী-তারা।
ধরাতল মরুভূমি; নাহি তাহে আর
সুশোভার চিহ্ন-মাত্র। শব্দ-বহ হায়!
নিঃশব্দ আমার কানে। কেবল, স্বজনি!
দেখিলাম কি আকাশ, কিবা ধরাতল
এন্টনিতে পরিপূর্ণ! শুধু সমীরণ
বহিছে এন্টনি-স্বর! দেখিতে, শুনিতে,
কিম্বা ভাবিতে,—এন্টনি! ক্লিওপেট্রা কর্ণে,
কণ্ঠে, নয়নে, হৃদয়ে, এন্টনি কেবল!

আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন—
এণ্টনি সকল! সখি! কি বলিব আর,
হইল জীবন মম অবিকল ওই
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা-
কণা একটি এণ্টনি! দিবা, নিশি, পক্ষ,
মাস কিছুই আমার নাহি ছিল জ্ঞান।
গনিতাম কাল আমি বৎসরে কেবল।
অনন্ত ভুজঙ্গ-সম কাল-বিষধর,
দাঁড়াইয়া একস্থানে, হতো হেন জ্ঞান,
দংশিছে আমায় যেন অনন্ত যন্ত্রণায়।
প্রভাতে উঠিল রবি, ভাবিতাম মনে,
জিনিতে মিশর ওই আসিছে এণ্টনি,
রণবেশে! রবি অস্তে, সায়াহ্নে আবার
ভাবিতাম বীরশ্রেষ্ঠ চলি গেলা রোমে।
হাসিমুখে শশধর ভাসিলে গগনে,
ভাবিতাম আসিতেছে এণ্টনি আবার,
প্রণয়-পীযূষে হায়! জুড়াতে আমায়।
অস্ত গেলে নিশানাথ প্রাণনাথ গেলা
ছাড়ি ভাবিতাম মনে।
"এইরূপে সখি!
গেল যুগ, গেল বর্ষ, কিংবা মাস, দিন,
নাহি জানি। একদিন তাপিত হৃদয়
জুড়াইতে জ্যোৎস্নায়, শুয়েছি নিশীথে
সুকোমল 'কৌচ'-অঙ্কে, ছাদের উপরে।
সেইদিন দূত-মুখে, নব-পরিণয়
এণ্টনির, নারী-রত্ন 'অগস্তা'র* সনে
শুনিয়াছিলাম;—তরুভ্রষ্ট হায়! যেই
বিশুষ্ক বল্লরী, কেন রে দারুণ বিধি!
হেন বজ্রাঘাত পুনঃ তাহার উপরে?
শুয়েছি; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ
প্রসারিত,—নাক্ষত্রিক চারু-রঙ্গ-ভূমি!
মধ্যস্থলে শশধর হাসিয়া-হাসিয়া
রূপের গৌরবে যেন ঢলিয়া-ঢলিয়া
করিতেছে অভিনয়। নক্ষত্র সকল

---

*এণ্টনির দ্বিতীয়া পত্নী।

নীরবে, অচলভাবে করিছে দর্শন
সেই সুশীতল রূপ! কেহ বা আনন্দে
জ্বলিতেছে; অভিমানে নিবিতেছে কেহ;
কেহ রূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া।
ছুটিছে জীমূত-বৃন্দ উন্মত্তের-প্রায়
আলিঙ্গিতে সেইরূপ; উথলিছে সিন্ধু;
রূপে মুগ্ধ—অধিক কি—ঘুরিছে ধরণী।
এই অভিনয় সখি! দেখিতে দেখিতে
কতই নিদ্রিত ভাব উঠিল জাগিয়া
হৃদয়ের! সময়ের তামস-গহ্বরে,
এই চন্দ্রালোকে, অঙ্কে-অঙ্কে দেখিলাম
বিগত জীবন। কভু ভাবিলাম মনে,
আমি চন্দ্র, মেঘবৃন্দ বীরেন্দ্র-সকল;
নক্ষত্র মানবচয়; আমি শশধর,
সিন্ধু বীরের অন্তর। আবার কখন
ভাবিলাম আমি চন্দ্র, ধরণী এন্টনি।
ভাবিতেছিলাম পুনঃ এই চন্দ্রালোকে,
নব-প্রণয়িনী-পাশে, নব-অনুরাগে,
বসিয়া সুদূর রোমে প্রাণেশ আমার,
ভুলিছে কি ক্লিওপেট্রা? ভাবিছে কি মনে-
'কোথায় নীলজ চারু ফণিনী আমার'—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ? কিংবা অগস্তার
নবীন প্রণয়-রাজ্যে এবে এন্টনির
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয়?
করেছে কি ক্লিওপেট্রা চির-নির্বাসিত,
নবীনা সপত্নী নামে, ওলো চার্‌মিয়ন্‌?
জ্বলিয়া উঠিল তীব্র ঈর্ষার অনল
রমণী-হৃদয়ে; যেন বিশুষ্ক কাননে
অকস্মাৎ প্রবেশিল ভীম দাবানল।
রমণীর অভিমানে রমণী-হৃদয়
ভরিল। আরক্ত নেত্রে ছুটিল অনল।
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে
ধরায় কলঙ্করাশি ঠেলেছিল পায়ে,
আজি অপমানে পুনঃ সেই বৃত্তি-চয়
হল খড়গ-হস্ত সেই প্রণয়-ঘাতকে।
সষুপ্ত ভুজঙ্গ যেন, দুষ্ট প্রহারকে,
বিস্তারিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে।

'কি? মিশরের ঈশ্বরী! টলেমি-দুহিতা!
ক্লিওপেট্রা আমি! রূপে বিশ্ব-বিমোহিনী!
যে রূপের তেজে সেই ভুবন-বিজয়ী
সিজারের তরবারি পড়িল খসিয়া।
সামান্য গুঞ্জিকা-তরে, সে রূপ-রতন
এন্টনি ঠেলিল পায়ে?' তীরের মতন
বসিনু শয্যায়; কিন্তু দুর্বল শরীর
দুরূহ যন্ত্রণা, চিন্তা সহিতে না পারি,
ভুজঙ্গে দংশিতে যেন, পড়িল ঢলিয়া
শয্যার উপরে পুনঃ। মধুরে তখন
বহিল শীতল 'নীল'-নীলজ অনিল।
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার
অর্ধ-নিদ্রা, অর্ধ-মূর্ছা, ক্লান্ত কলেবরে।
দেখিনু স্বপন, সখি! কি যে দেখিলাম,
এখনো স্মরিতে কেশ হয় কণ্টকিত।
দেখিনু শার্দূল এক,—ভীষণ-আকৃতি!—
নিবিড় অরণ্যে মম ধাইছে পশ্চাতে,
বিস্তারিয়া মুখ! 'ত্রাহি-ত্রাহি'—বলি আমি
চাহিনু আকাশ-পানে। দেখিলাম সখি!
অপূর্ব তপন এবে উদিল গগনে
উজ্জ্বলিয়া দশ-দিশ্। করে আকর্ষিয়া
সেই মার্তণ্ড আমারে তুলিল আকাশে,
সখি! আমি শোভিলাম শশধর-রূপে
বামে সখি, তার। হায় এমন সময়ে
অকস্মাৎ রাহু আসি গ্রাসিল তাহারে।
হইয়া আশ্রয়হীনা আমি অভাগিনী
পড়িতেছিলাম বেগে, অর্ধ-পথে সখি!
বীর-সূর্য অন্যজন, হৃদয় পাতিয়া,
লইল আমারে। আমি আনন্দে মাতিয়া,
পরাইনু প্রেম-হার গলায় তাহার।
কিন্তু কি কুক্ষণে হায়! বলিতে না পারি!
যে হার-পরশে বীর হৃদ তাহার,—
ফাটিত যে উরস্ত্রাণ রণরঙ্গে মাতি;
হইল বিলাসে যেন নারী সুকুমারী!
পিধান হইতে অসি পড়িল খসিয়া,
(অরাতি মস্তকে ভিন্ন, নামে নাহি যাহা,)
কুসুম শয্যায়। শেষে মাথার মুকুট,

পড়িল খসিয়া ওই ভূমধ্য-সাগরে,
অস্তগামী রবি যেন! কি বলিব আর,
যেই বক্ষে অরাতির অসংখ্য কৃপাণ
গিয়াছে ভাঙিয়া,—যেন প্রচণ্ড শিলায়
স্ফটিকের দণ্ড, কিংবা মত্ত গজদন্ত,
হায় রে! যেমতি চন্দ্র-পর্বত-প্রস্তরে,—
মম প্রেমহাব তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতো,
সেই বক্ষে প্রিয় সখি পশিল আমূল!
তখন সে হার ধরি ভুজঙ্গের বেশ,
ছুটিল পশ্চাতে মম। সভয়ে তখন,
ডাকিতেছি—'কোথা নাথ! এমন সময়ে,
কোথা নাথ!' —
'প্রিয়ে এই চরণে তোমার!'—
যে সংগীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণে,
সে সংগীত ক্লিওপেট্রা শুনিবে না আর।
ভাঙিল স্বপন সখি, ফুটিল চুম্বন,
বিশুষ্ক অধরে মম। মেলিয়া নয়ন,
দেখিলাম প্রাণনাথ হৃদয়ে আমার!
অভিমানে বলিলাম,—'সে কি নাথ, ছাড়ি
রোমরাজ্য, ছাড়ি নব-প্রণয়িনী, কেন
এখানে আপনি? কিংবা এ আপনি নন,
এই ছায়া আপনার আসিয়াছে বুঝি,
বিরহ-আতপ-তাপে জুড়াতে আমায়।'
'নিমজ্জিত হোক রোম টাইবরের জলে,
রাজ্য, প্রণয়িনীসহ। এই রাজ্য মম',—
বলিয়া হৃদয়ে ধরি হৃদয় আমার।
'প্রণয়িনী ক্লিওপেট্রা; ইহ-জীবনের
সুখ এই',—পুনঃ নাথ চুম্বিলা অধর;
'জীবন তোমার প্রেম, বিরহ, মরণ!'
"দূরে গেল অভিমান, রমণীর প্রেম-
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম, 'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য তব? অনন্ত জলধি-
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়া-সাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?

প্রণয়-বারিদ তুমি! তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
জোগাবে অনন্ত বারি, এই প্রেমাধিনী।"
"মৈশরী-হৃদয়াকাশে প্রণয়ের শশী
প্রকাশিল যদি পুনঃ, মিশরে আবার
ছুটিল দ্বিগুণ বেগে আমোদ-জোয়ার।
কত রাজ্য-সিংহাসন, আসিল ভাসিয়া
ক্লিওপেট্রা-পদতলে বলিব কেমনে।
সমস্ত পূরব রাজ্য মিলি একতানে,—
'পূরব রাজ্যের রানী, মিশর-ঈশ্বরী!'—
গাইল আনন্দস্বরে। সেই ধ্বনি রোমে
জাগাইল সুপ্ত সিংহ কনিষ্ঠ সিজার*
কুক্ষণে। কুগ্রহ সখি! হইল তখন
ক্লিওপেট্রা, এন্টনির অদৃষ্টে সঞ্চার।
শুনিনু গর্জন তার সহস্র কামানে,
মিশরে বসিয়া সখি! ছুটিল হর্যক্ষ
অসংখ্য অর্ণবপোতে, গ্রাসিতে মিশরে,
শতধা বিদারি ভীম ভূমধ্য-সাগর,
সহোদরা-অপমান প্রতিবিধানিতে।**
নির্ভয় হৃদয়ে সখি! সাজিল এন্টনি,
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে।
বলিলা আমাদের নাথ! হাসিয়া-হাসিয়া—
'মিশরে বসিয়া প্রিয়ে! দেখো মুহূর্তেকে
বালকের ক্রীড়া-সাধ আসি মিটাইয়া।'
ধৈর্য মানিল না মনে; ভাবিলাম যদি
পাপিষ্ঠা সপত্নী আসি প্রাণেশে আমার
লয়ে যায় এ কৌশলে। বলিলাম—'নাথ!
বহুদিন-সাধ মম করিতে দর্শন
অর্ণব-আহব, প্রভু পূরাও সে সাধ,
তুমি যদি না পূরাবে কে পূরাবে আর
বীরেন্দ্র!' হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,—
'সাজো তবে, বীরেন্দ্রাণি! বালকের রণে
মহারথী ক্লিওপেট্রা, সারথি এন্টনি!'
আপনি প্রাণেশ, রণবেশে সাজাইলা
আমায়, স্বজনি সুখে! সাজাইতে, হায়!

---

* অগস্টাস সিজার।
** এন্টনির দ্বিতীয়া পত্নী অগস্টাস সিজারের সহোদরা ছিলেন।

কত যে কি সুখ নাথ দেখিলা নয়নে,
চুম্বিলা অধরে, সখি! পরশিলা করে,
বলিব কেমনে? অঙ্গে-অঙ্গে বিরাজিয়া
স্ফুট নলিনীর, অলির যে সুখ, পদ্ম
বুঝিবে কেমনে? আমি আপনি স্বজনি!
বীরবেশে প্রেমাবেশে হইনু বিভোর।
ফুরাইলে বেশ; নাথ হাসিয়া আদরে,
সমর্পিয়া করে চারু-কুসুমের হার,
বলিলা—'কি কাজ প্রিয়ে! অস্ত্রেতে তোমার?
বিনা রণে, এই অস্ত্রে জিনিবে সংসার'।
"অসংখ্য অর্ণবযান, সৈন্য, অস্ত্রভরে
প্রায় নিমজ্জিত কায়; বিশাল ধবল
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে,
বিক্রমে ফেনিয়া সিন্ধু, চলিল সাঁতারি
যেন প্রমত্ত বারণ। চলিলাম আমি
নির্ভয়ে, কেশরী যেই হরিণীরে সখি!
দিয়াছে অভয়, তার কি ভয় জগতে?
বীর-প্রণয়িনী আমি, বীরের সঙ্গিনী,
ডরিব কাহারে? কিন্তু অবলা-মনের
না জানি কি গতি! যত আশ্বাসিয়া মন
করি ভাসমান, ততো ভাবী আশঙ্কায়
হইতেছে ভারী! ততোকাল রঙ্গে মম
চকিত কল্পনা, হায়! অজ্ঞাতে কেমনে,
চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ! যদিও না জানি,—
পরচিত্ত-অন্ধকার!—বুঝিনু তথাপি
ভাবী অমঙ্গল-ছায়া পড়েছে হৃদয়ে
এন্টনির। লুকাইতে সে করাল ছায়া
রমণীর কাছে নাথ, হয়েছে মগন
সংগীতে-সুরায়।
দ্রুত ভাঙিল স্বপন।
ভয়ঙ্কর!! একি দেখি সম্মুখে আমার!
অসীম বারিদ-পুঞ্জ, ভীম-কলেবর,
পড়েছে খসিয়া ওকি জলধি-হৃদয়ে?
খেলিছে বিদ্যুৎ ওকি জীমূত-ঘর্ষণে?
ওকি শব্দ ভয়ঙ্কর? জীমূত-গর্জ্জন?
সকলই ভ্রম। সখি, শুকাইল মুখ;
বিপক্ষ তরণী-ব্যূহ সজ্জিত সমরে!

বিদ্যুৎ,—কামান-অগ্নি, দুর্জয় কামান
মুহুর্মুহু মেঘমন্দ্রে গর্জিছে ভীষণ!
সেই দৃশ্য—নেত্রে, কর্ণে, চিত্তে ভয়ঙ্কর!—
দেখিলাম চারমিয়ন, বলিব কেমনে
কামিনী-কোমল-হৃদয়ে? দেখে থাকো যদি
প্রতিকূল প্রভঞ্জনে প্রাবৃট-অম্বোদ
আঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন,
ছিন্ন নক্ষত্র-মণ্ডল, বুঝিবে কেমনে
প্রতিকূল তরীব্যূহ পশিল সংগ্রামে।
মুহূর্তেকে ধূম-পুঞ্জে ঢাকিল জলধি
আঁধারিয়া দশদিশ্; কিন্তু না পারিল
সংহারক রণমূর্তি লুকাতে আঁধারে।
সেই অন্ধকারে সখি! অঙ্গ মিশাইয়া
তরীর উপরে তরী ঝাঁপ দিল রোষে।
গর্জিল কামান, ঝাঁপ দিল শত সূর্য
ফেনিল সাগরে, তরীবৃন্দ বিদারিয়া
নিমজ্জিয়া জলে, নররক্তে কলঙ্কিয়া
সুনীল সলিলে। হায়! সখি, তুচ্ছ নর,
আপনি জলধি, সেই ভীষণ নির্ঘাত,
তীব্র অনল-বর্ষণ, না পারি সহিতে,
করিতেছে ছট্ফট্ উত্তাল তরঙ্গে,
ফেনিয়া-ফেনিয়া; ঘন-ঘন নিশ্বাসিয়া
পড়িতেছে আছাড়িয়া কূলের উপরে।
তরণীর প্রতিঘাত; কামান-গর্জন;
দহ্যমান তরণীর অনল-হুঙ্কার;
বন্দুকের অগ্নিবৃষ্টি, অস্ত্র-ঝনৎকার;
জেতার বিজয়ধ্বনি; জিতের চিৎকার;—
ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ, সিন্ধু-আস্ফালন
ভয়ঙ্কর! নিরখিয়া উড়িল পরান ;
অবলা হৃদয় ভয়ে হইল অচল।
বলিলাম কর্ণধারে,—'ফিরাও তরণী,
বাঁচাও পরান।' আজ্ঞামাত্র সংখ্যাতীত
ক্ষেপণী-ক্ষেপণে, বেগে চলিল তরণী
মিশর-উদ্দেশ্যে হায়! মন্দুরার মুখে
ছুটিল তুরঙ্গ যেন। কিছুক্ষণ পরে
সভয়ে ফিরায়ে আঁখি দেখিতে পশ্চাতে,
দেখিলাম ভাঙিয়াছে কপাল আমার!

না দেখি তরণী মম, রণে ভঙ্গ দিয়া
উন্মত্তের প্রায় ওই আসিছে এন্টনি!
আকাশ ভাঙিয়া হায়! পড়িল মস্তকে
অকস্মাৎ! ভাবিলাম মনে, এ সময়ে
নাথের সহিত যদি হয় দরশন,
অনুতাপে নাহি জানি কোন্ অপমান
করিবে আমার; হায়! কেন আসিলাম,
আমি কেন মজিলাম। নাহি ডুবিলাম
কেন জলধির তলে? নাহি মরিলাম
সেই বিষম সংগ্রামে, নাথের সম্মুখে?
কেন আসিলাম আমি!—কেন মজিলাম!
"অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষের মতো
অবতীর্ণ হইলাম মিশরের তীরে
বহুদিনে! এই রণে গিয়াছিনু, সখি!
এন্টনির সোহাগিনী, পৃথিবীর রানী,
আসিলাম ভিখারিনী ডুবায়ে এন্টনি।
চলিলাম গৃহমুখে, বিসর্জন করি
মাথার মুকুট, ভাবী রোম-সিংহাসন,
এন্টনির প্রেম,—হায়! মৈশরী-জীবন!—
ভূমধ্য-সাগরে; এই জীবনের মতো
বিসর্জিয়া যত আশা-আকাশ-কুসুম,
চলিলাম গৃহে:—কোন্ মতে, কোন্ পথে,
নাহি ছিল জ্ঞান। নিল উড়াইয়া যেন
মানসিক ঝটিকায়। প্রবেশি প্রাসাদে
দেখিলাম অন্ধকার! নাহি সে মিশর
রাজ্য, নাহি রাজধানী, দেখিনু কেবল,—
অন্ধকার,—মরুভূমি,—সমস্ত ভূতল
হইতেছে তরঙ্গিত ভীম ভূকম্পনে।
সেই অন্ধকার, সেই মরুভূমি-মাঝে
দেখিনু কেবল—মম সমাধি-ভবন!
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি!
বলিলাম—তোমারে কি? না হয় স্মরণ,
চারমিয়ন্! বলিলাম—'আসিলে এন্টনি,
অনুতাপে ক্লিওপেট্রা ত্যজিল জীবন,
বলিও প্রাণেশে মম; বলিও তাঁহারে,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা—'ক্ষমিও এন্টনি!'
সমাধির দ্বারে সখি! পড়িল অর্গল।

"আসিল এন্টনি; সখি! নাথের সে মূর্তি
স্মরিলে এখনও মম বিদরে হৃদয়!
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, উন্মত্ত, উজ্জ্বল!
প্রশস্ত ললাট যেন ধবল প্রস্তর,
নাহি রক্ত-চিহ্নমাত্র! বিষাদ লিখেছে
রেখা কপোলে, কপালে, অনুকারী যেন
বার্দ্ধক্যে! চিত্রেছে শুক্লে মস্তক সুন্দর!
এত রূপান্তর সখি! এই কতদিনে
গিয়াছে নাথের যেন কতই বৎসর!
শুনিলা সখির মুখে, স্তম্ভিতের মতো,—
'অনুতাপে ক্লিওপেট্রা, ত্যজিল জীবন,
মৈশরীর শেষ ভিক্ষা 'ক্ষমিও এন্টনি!'
'ক্ষমিলাম'—বলি নাথ হৃদয় চাপিয়া
দুই হাতে, প্রবেশিলা রাজ-হর্ম্যে বেগে,
বিদ্যুতের গতি! হেনকালে চারিদিকে
উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাহল।
ভূমধ্য-সাগর যেন তীর অতিক্রমি
প্লাবিল মিশর! ত্রাসে বাতায়ন-পথে
দেখিলাম, নহে সিন্ধু, সৈন্য সিজারের
লুটিতেছে হতভাগ্য নগর আমার।
অপূর্ব সিজার-গতি। চক্ষুর নিমেষে
ঘেরিল সমস্ত পুরী, সমাধি আমার,—
পড়িনু ব্যাধের জালে আমি কুরঙ্গিনী!
কিন্তু ওকি সহচরি? সমাধির তলে?
ওই শয্যার উপরে?—মুমূর্ষু এন্টনি!
চাহিলাম ঝাঁপ দিতে শয্যার উপরে,
তুমি ধরিলে অমনি। তুলিলাম নাথে
সমাধির উপরে, হায়! সমাধির উপরে!
এইছিল লেখা সখি! কপালে আমার,
কে জানিত! প্রাণনাথ বলিলা আমারে—
সেই স্বর প্রিয়সখি! অস্ফুট-দুর্বল!—
'মৈশরি! ভবের লীলা ফুরাইল আজি
এন্টনির; পৃথিবীতে প্রেয়সি! আমার
আর নাহি প্রয়োজন; ফুরাইল কাল,
আমি যাই অস্তাচলে। এই অস্ত্র-লেখা
প্রিয়ে হৃদয়ে আমার, নহে শত্রুদত্ত;
হেন সাধ্য কার? নাহি এই ভূমণ্ডলে

এন্টনি বিজয়ী,—বিনে ক্লিওপেট্রা,—আজি
এন্টনির করে প্রিয়ে! আহত এন্টনি।
আসিয়াছি, শেষ সুরাপাত্র করি পান
তব সনে, প্রণয়িনী! লইতে বিদায়;
দাও, প্রিয়তমে! যাই—বিদায়-চুম্বন।"
"সুরা করিলাম পান, চুম্বিনু চুম্বন;
শুনি অস্ফুট স্বরে, স্বপ্নের মতন—
'ক্লিও—পেট্রা!—প্রণ—য়ি—নী!'
'প্রাণনাথ! আমি
ক্লিওপেট্রা অভাগিনী!'—বলি উচ্চৈঃস্বরে,
আঁটিয়া হৃদেশে সখি! ধরিনু হৃদয়ে।
দেখিলাম ক্রমে-ক্রমে যুগল-নয়ন—
জ্যোতিতে যাহার রোম আছিল উজ্জ্বল,
অসংখ্য সমর-ক্ষেত্রে, কিরণ যাহার
ছিল বিভাসিত যেন মধ্যাহ্ন-তপন,
খেলিত বিদ্যুৎ-মতো সৈন্যের হৃদয়ে
উত্তেজিয়া রণরঙ্গে;—নিবিল ক্রমশ।
মানব-গৌরব-রবি হল অস্তমিত।
'প্রাণেশ্বর! প্রাণনাথ! এন্টনি আমার!'—
ডাকিলাম বারম্বার উন্মাদিনী-প্রায়;
'প্রাণেশ্বর! প্রাণনাথ; এন্টনি আমার!'—
শুনিলাম উত্তরিল সমাধি-ভবন—
প্রাণে—শ্বর!—প্রাণ!—"

দ্বিতীয় সর্গ

কাননে

নিবিড় কানন; নিশি তৃতীয় প্রহর।
কানন-কালীর শ্বেত-প্রস্তর-মন্দির
শোভিতেছে, বহিরঙ্গ স্নাত চন্দ্রালোকে!
অন্তঃস্থল আচ্ছাদিত নিবিড় তিমিরে!
সুন্দর-বনের কোন্ স্বর্গীয় ভূপতি,
আসি মর্ত্যধামে যেন নিশীথ-সময়ে
কাঁদিছে নীরবে, দেখি—আছিল যথায়
প্রজা-কোলাহল-পূর্ণ রাজ্য সুবিস্তৃত—
ঝিল্লি-সমাকীর্ণ এই নিবিড় কানন!
শরীর স্বর্গীয়-শুভ্র-বসনে আবৃত—
শিশির অশ্রুতে সিক্ত! শোকের তিমিরে
এইরূপে অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্ন অন্তর!
মন্দিরের অভ্যন্তরে, জ্বলিল হঠাৎ
একটি প্রদীপ ক্ষুদ্র! ক্ষীণালোকে তার
দেখাইল মধ্যস্থলে কানন-কালীর
অস্পষ্ট মুরতি ভীমা! একপার্শ্বে বসি
তপস্বিনী; অন্যপার্শ্বে নিমজ্জিত ঘোর
নিদ্রার সাগরে এক যুবক সুন্দর।
কোমল চরণক্ষেপে, অতি সাবধানে
গেলা তপস্বিনী সেই শয্যার নিকটে।
দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে, সুষুপ্ত যুবার
মুখচন্দ্র কিছুক্ষণ করি দরশন,
ধীরে-ধীরে গেলা বৃদ্ধা কবাটের কাছে,
ধীরে সুকোমল করে টানিলা অর্গল।
খুলিল কবাট যেই, পশিল মন্দিরে
নৈশ সমীরণ-স্রোতে ঝিল্লির ঝংকার।

রাখিয়া চরণ এক চৌকাষ্ঠ-উপরে
যোগিনী শুনিলা সেই গম্ভীর নিনাদ
মুহূর্তেক স্থিরভাবে। অতি ধীরে-ধীরে
নামিলা সোপানশ্রেণী; শেষে অতিক্রমি
মন্দির-প্রাঙ্গন ক্ষুদ্র, বসিলা নীরবে
সমীপ-সরসী-তীরে, ঘাট-শিলাসনে।
সুধাকর সুধাকরে পবিত্র চরণে
প্রণমিয়া, দেখাইয়া হাসিয়া অমনি
কৌমুদীমণ্ডিত শান্ত কানন-আশ্রম,
শান্ত, অচঞ্চল নীল সরসী-সম্মুখে;
পশ্চাতে অমল শ্বেত-প্রস্তর-মন্দির,—
শান্তমূর্তি! উচ্চচূড়ে—উচ্চতর এবে
চন্দ্রালোকে,—শোভিতেছে রজত-ত্রিশূল,
অঙ্গুলি-নির্দেশ যেন করিছে নীরবে
নিশানাথে, না লঙ্ঘিতে নৃমুণ্ডমালিনী
ভীমা! সে সংকেতে যেন শশধর ভীত
মনে ভাবিতেছে—ওই বনরাজি-শিরে
কানন-কিরীটীরূপে!—'যাই কোন্ পথে।'
হায়! ওই সুধাংশুর সিংহাসন-তলে
মরি কি পার্থিব চিত্র! কৃষ্ণপক্ষ ছায়া
আজি করিয়াছে যথা, সুধাংশু-মণ্ডল-
রেখা মাত্রে পরিণত; হায় রে তেমতি
এ বিশাল রাজপুরী অদৃষ্ট-ছায়ায়
আজি আচ্ছাদিত; আছে চিহ্নমাত্র তার—
কালী করালিনী,—এই সরসী,—প্রাচীর।
সে রাজতোরণে উচ্চ প্রাচীর-উপরে
গুরুপদক্ষেপে ধীরে ভ্রমিত প্রহরী
শত-শত, হায় যেন নিশীথ-সময়ে,
উলঙ্গ কৃপাণে প্রতিফলিয়া চন্দ্রমা;
সুবর্ণ পর্যঙ্কে শুয়ে কুসুম-শয্যায়,
বেষ্টিত মৃণাল-ভুজে রূপসী-হৃদয়ে
জুড়াত দিবসক্লান্তি, এমন নিশীথে
নরেন্দ্র নৃপতি; আজি—কি বলিব হায়!—
বিরাজে তথায় আজি, প্রাচীরের স্থলে,
উচ্চ মহীরূহচয়, প্রতিবিম্ব পত্রে-
পত্রে সুধাংশুর কর। আজি তথা হায়!

বিবর-শয্যায় সুপ্ত মৃগেন্দ্র-কেশরী,
ভ্রমিতেছে ইতস্তত শার্দূল প্রহরী!
কিন্তু প্রকৃতির শোভা চন্দ্রের কিরণে,
কি কাননে, কি উদ্যানে, ভূধরে, সাগরে,
সর্বত্রে সুন্দর হেন নিদাঘ-নিশীথে!
অসীম হৃদয়গ্রাহী নিবিড় কাননে
চন্দ্রের কিরণ-তলে, মহীরুহচয়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে সংখ্যাতীত ভুজে,
(চিরপ্রেমে বদ্ধ যেন!) আছে দাঁড়াইয়া
বেষ্টিয়া আশ্রম ঘন, স্তবকে-স্তবকে।
পবিত্র আশ্রমে, পাপী মানব-চরণ
না পারে পশিতে যেন, আছে সসজ্জিত
সংখ্যাতীত প্রসরণে, অসংখ্য প্রহরী
নীরব, সশস্ত্র কর! নীরব সকল,
যেন তাপসীর যোগ-চিন্তার লহরী
সশঙ্কিত ভাঙে পাছে; যোগ-নিদ্রা হতে
জাগে পাছে যোগেশ্বর, অনন্ত শয়নে
চামুণ্ডাচরণতলে। নৈশ সমীরণ
কেবল স্বনিছে, কভু কানন-ভিতরে
চুম্বি সুধাকর-সুধা, পল্লবে-পল্লবে!
কেবল কখন বনে শুনা যায় দূরে
শুষ্ক পত্রে, নিশাচর-পদ-সঞ্চালন।
কেবল কখন দূরে শার্দূল-গর্জন,
শৃগালের খেখা-ধ্বনি, পেচক-চিৎকাব,
ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গের পক্ষ-সঞ্চালন,
ভাসিছে নির্জনে; ভাসে যথা চক্রচয়,
স্থির সরোবর-বক্ষে শিলা-প্রক্ষেপণে।
কিংবা নীলাকাশে যথা তারকা খসিয়া,
মুহূর্ত উজ্জ্বলি পুনঃ মুহূর্তে মিশায়;
ভাসিয়া নির্জনে শব্দে, মিশিছে তেমনি।
সম্মুখে বিস্তৃত সরঃ। কৌমুদী-কিরণে
শোভিতেছে কারুকার্যে,—কুমুদ, কহ্লার,
আরণ্য নীরজ ফুলে, শ্যামল পল্লবে
শ্বেত, রক্ত, নীল পুষ্পে। বিচিত্র বসনে
রেখেছে ঢাকিয়া যেন, অমল-তরল
বক্ষ বঙ্গকুলনারী! সুধাংশুর অংশু-
রাশি, পড়ি স্থানে-স্থানে সরসীসলিলে,

শোভিতেছে মনোহর বসন বিচ্ছেদে
চারু-আভরণ যথা! শোভিতেছে তীরে
ডালে-ডালে, বৃন্তে-বৃন্তে, স্থলজ কুসুম,
স্বভাব-প্রসূত! পুষ্পবৃক্ষ অন্তরালে
সরোবর তীরে; কিংবা পল্লব বিচ্ছেদে
স্থানে-স্থানে বনমাঝে পড়েছে খসিয়া,
অসংখ্য কৌমুদখণ্ড, শ্যামদূর্বাদলে।
শ্যামল অটবীশ্রেণী, আরণ্য-বল্লরী,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, আরণ্য আহ্লাদে,
অসংখ্য রতনরাশি, কৌমুদী-কিরণে,
পরিয়া শ্যামল অঙ্গে, রেখেছে সাজায়ে
অচিত্র কানন-শোভা!—অচিন্ত্য সুন্দর।
শিলাসনে সরোবর-তীরে তপস্বিনী
বসি একাকিনী। কিন্তু স্থির দু-নয়নে—
অনিমেষ, অচঞ্চল,—দেখিছে কি ওই
কৌমুদীপ্রদীপ্ত নীল আকাশের পানে?
কিংবা এই প্রসারিত নীলাম্বর-তলে,
অনন্ত কানন-কান্তি, চন্দ্রিকামণ্ডিত?
কিংবা শুনিতেছে ওই নৈশ সমীরণে
কি কহে অস্ফুট স্বরে? কে বলিবে হায়?
বিলম্বিত জটারাশি, পড়েছে ঝুলিয়া
যুগল কপোলে, অংশে, উরসে, পশ্চাতে।
জটারণ্য-অন্তরালে, বৃদ্ধা তাপসীর
গৌর কলেবরকান্তি শোভিতেছে, হায়,
বন-অন্তরালে যথা চন্দ্রের কিরণ।
রমণীর স্থির মূর্তি, শান্ত দু-নয়ন,
রক্তজটাজুটভার, রক্তিম বসন,
দেখে বোধ-হয় যেন কানন-ঈশ্বরী
বনদেবী, বসি এই সরোবর-তীরে,
আপন অনন্ত রাজ্য করিছে দর্শন।
এইরূপে কিছুক্ষণ বসি তপস্বিনী
চিন্তাকুল মনে, পুনঃ ফিরিলা মন্দিরে
কোমল চরণে। পদপঙ্কজ পরশে
নমিল না প্রাঙ্গণের শ্যামদূর্বাদল,
বর্ষিল আনন্দে দূর্বা কৌমুদী-সাগরে
শিশিরাশ্রু, প্রক্ষালিয়া পাদপদ্ম। সেই
পবিত্র চরণামৃত করিলেক পান
আনন্দে বসুধা।

বামা পশিলা মন্দিরে
বীরেন্দ্রের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নীরবে।
নিদ্রিত যুবক; কিন্তু নিদ্রার সাগরে
নাহি শান্তি,—বহিতেছে কুস্বপ্ন-ঝটিকা।
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ; নেত্রে অশ্রু বিগলিত;
বিষাদ-কালিমাময় বদনমণ্ডল;
ঘন-ঘন শ্বাস; স্বেদনিষিক্ত ললাট।
গৌরব-বিকাশ সেই ললাট হইতে
স্বেদবিন্দু, তপস্বিনী বসন-অঞ্চলে
পুঁছিয়া, ডাকিলা, 'বৎস!'—হায়! সেই স্বর
পরদুঃখে তরলিত, নারী-হৃদয়ের
শীতল উচ্ছ্বাস! হায়! সেই স্নেহস্বর,
দুঃখপূর্ণ জগতের শান্তির সংগীত!
স্বেদসিক্ত কেশগুচ্ছ ললাট হইতে
সরাইয়া, সুকোমল করে তপস্বিনী—
চন্দ্রমামণ্ডল হতে নীরদের রেখা
সরায় যেমতি ধীরে শারদ-অনিল—
ডাকিলা মধুরে—"বৎস বীরেন্দ্র!"—আবার।
সঞ্জীবনী সুধারাশি শ্রবণে যুবার
প্রবেশিল সেই স্বরে। মেলিলা নয়ন
যুবা। মন্ত্রমুগ্ধ যেন, রহিলা চাহিয়া
তপস্বিনী মুখপানে, আয়তলোচনে—
অতি-প্রসারিত নেত্র, স্থির, অচঞ্চল,
অস্বভাব-আভা-পূর্ণ। ধীরে তপস্বিনী
জিজ্ঞাসিল পুনঃ—"বৎস!"—পুনঃ সেই স্বর-
"দেখিতে কি ছিলে তুমি কোন্ কুস্বপন?"
"কুস্বপ্ন" বলিলা যুবা; নামিল নয়ন।
ললাটের স্বেদবিন্দু মুছি ধীরে-ধীরে;
মুছিয়া নয়নদ্বয়, বলিলা যুবক—
"কুস্বপ্ন—কুস্বপ্ন দেবি! দেখিতেছিলাম
অসুখ নিদ্রায় আমি! দেখিতেছিলাম
এক মহাপারাবার, অনাদি, অনন্ত,
ফেনিল-তরঙ্গ-পূর্ণ, ভীম-প্রভঞ্জন
গর্জিছে ঝটিকানাদে, জলধি-হৃদয়ে;
গর্জিছে জীমূত-মন্দ্র, ঘোর কৃষ্ণাম্বরে।
ঘোরতর অন্ধকার! ভগবতি, সেই

ঘোর অন্ধকারে, সেই ভৌতিক বিপ্লবে,
দেখিলাম হায়! সেই কৃষ্ণ পারাবারে
তরঙ্গে-তরঙ্গে ডুবি, ভাসিতেছে মম
কুসুমিকা, আলোকিয়া সেই অন্ধকার;
ভাসে যথা নীলাম্বরে শারদ-চন্দ্রিমা
লুকাইয়া মেঘে-মেঘে ভাসিয়া আবার।
কোথা হতে এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম
না হয় স্মরণ; হায়! উন্মত্তের মতো
ঝাঁপ দিতে চাহিলাম সমুদ্রের জলে,
তুলিতে সে রূপরত্ন;—অকস্মাৎ হায়!
শুনিনু আকাশ-বাণী—'বীরেন্দ্র!—বীরেন্দ্র!
পড়িও না বৎস এই কাল-পারাবারে,
এই রক্ষিতেছি আমি কুসুমিকা তব।'
সেই স্নেহসিক্ত কণ্ঠ পশিল হৃদয়ে,
জাগিল পূরব স্মৃতি বেগে হিল্লোলিয়া।
চিনিলাম সেই স্বর, হায়! এ জগতে
যেই স্বর একমাত্র নহে তুলনীয়!
চাহিনু আকাশপানে তুলিয়া বদন,
দেখিলাম মায়ামূর্তি—জননী আমার!
নিবিড়-নীরদাসনে বসি মায়াময়ী,
পবিত্র আভায় মাতা, ঝলসি, আকাশে
সকাশ নীরদমালা, প্রসন্ন বদনে
চেয়ে মম-পানে, স্নেহসজল নয়নে।
একদিকে কুসুমিকা ঝটিকা-সাগরে
ভাসমান; অন্যদিকে জননী আমার
জলদ-আসনে বসি। ঘুরিল মস্তক
পড়িতেছিলাম আমি কাল-পারাবারে,
তব স্নেহ-সম্ভাষণে ভাঙিল স্বপন।"
নীরবিল যুবা। হায় রহিল নীরবে
তপস্বিনী; কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব।
উদাসিনী—স্থির নেত্রে প্রদীপের পানে
চেয়ে আছে,—নেত্রদ্বয় স্নেহার্দ্র-গম্ভীর।
ঊর্ধ্ব স্থির দৃষ্টি উচ্চ মন্দির-তিমিরে
যুবকের; উভয়ের নয়নের কাছে
শূন্য পটে যেন স্বপ্ন রহেছে চিত্রিত!
কি অর্থ?—উভয় যেন ভাবিতেছে মনে।

"এ কি স্বপ্ন, ভগবতি?"—আরম্ভিলা যুবা।
"অমঙ্গল এই স্বপ্ন বলিব কেমনে?
পঞ্চমবৎসরে যেই জননীর মুখ,—
ত্রিদিব আদর্শ, আহা, পার্থিব জগতে!—
শৈশবে তরল স্মৃতি-দর্পণ হইতে
কালের কালিতে যাহা হয়েছিল লয়;
শৈশবে, যৌবনে, হায়! জ্ঞানের আলোকে
কত কষ্টে, কত যত্নে, জাগ্রতে, নিদ্রায়
নাহি দেখিলাম যাহা, স্মৃতির দর্পণে
পুনঃ, হতভাগ্য আমি। আজি হায়, সেই
আনন্দময়ীর মুখ, দেখিনু, স্বপনে!
মা আমার!"—হায় যুবা কাঁদিতে লাগিলা,
"এতদিন পরে যদি স্মরিলা আমারে,
কেন দেখা দিলা মাতা জলদ-আসনে—
অগম্য আমার! যদি মাতা স্বপনেও
এই অভাগারে হায়! লইতে হৃদয়ে,
জুড়াত পরান মম, জুড়াইত হায়!
বিংশতিবর্ষের দীর্ঘ বিরহ তোমার!
ভগবতি! কেন মাতা বঞ্চিলা আমারে?"
কাঁদিলা যুবক, অশ্রু ভাসিল নয়নে
তাপসীর, বিন্দুদ্বয় ঝরিল অজ্ঞাতে।
"অথবা মঙ্গল-স্বপ্ন বলিব কেমনে?—
নিমজ্জিত কুসুমিকা কাল-পারাবারে।"
বীরেন্দ্রের সর্ব অঙ্গ হল রোমাঞ্চিত।
"বিধাতঃ! এই কি মম চিত্র-ভবিষ্যৎ!
ভগবতি! আপনি তো নর-অন্তর্যামী।
যোগবলে; একি স্বপ্ন? কি অর্থ তাহার?"
অর্থ? নদীগর্ভে দৃশ্য বলিবে বিজ্ঞান।
প্রথমে প্রচণ্ড বাত্যা; পরে শংকরের
নিপতন, নিমজ্জন; তটিনী-সৈকতে
পূর্বস্মৃতি; অবশেষে সন্তরণ-শ্রমে,
কিংবা সপ্তাহের জ্বরে, দুর্বল শরীর;
সকলের রূপান্তর স্মৃতি-ইন্দ্রজালে!
কিন্তু বৃদ্ধা তপস্বিনী, নর-অন্তর্যামী,
অন্তর জানিয়া বৃদ্ধা উত্তরিলা ধীরে—
"স্বপ্নে অমঙ্গল, বৎস! মঙ্গল নিদান।
বিঘ্ন-বিনাশিনী এই কানন-ঈশ্বরী
হরিবেন বিঘ্ন তব, তাপসীর বরে।

কিন্তু বৎস!"—কিন্তু বৎস বলি তপস্বিনী
নীরবিলা, হল কণ্ঠ অবরুদ্ধ যেন!—
"তপস্বিনী আমি, বৎস! বন-নিবাসিনী,
সংসারের সুখ-দুঃখে সম-উদাসিনী
আমি; কিন্তু, হায়, তব জননীর তরে
করুণ আক্ষেপে, মম কাঁদিল হৃদয়,—
ভেসে গেল যোগবল, যোগ-কঠোরতা,
সংসার-মায়ায় পুনঃ—পুনঃ নিষ্পেষিত
রমণীর চিত্তবৃত্তি উঠিল জাগিয়া।
কেবল এখন নহে; এই কয়দিন,
জ্বরেতে অজ্ঞান, বৎস! আছিলে যখন,
কখনো বা 'মা-মা' বলি ছাড়িতে নিশ্বাস,
কখন অস্ফুট স্বরে, বলিতে মধুরে,
'কুসুমিকা'। বল, বৎস! নাহি কি তোমাব
জননী রত্নগর্ভা? হায়! ভাগ্যবতী
নাহি জানি কত দুঃখে গিয়াছে ছাড়িয়া
হেন পুত্রনিধি! বলো, বৎস, তুমি যারে
দেখিলে স্বপনে, কেবা সেই কুসুমিকা?"
লজ্জাভরে বীরেন্দ্রের নয়ন-পল্লব
নামিল, আবার যুবা তুলিয়া নয়ন
উত্তরিলা—"ভগবতি! হায়! এ সংসার
দুঃখার্ণব, দুর্নিবার লহরী তাহার
না পারে পশিতে কিন্তু তাপস-আশ্রমে—
পুণ্যধাম! আমি কেন কলুষিব তাহা
আমার দুঃখের স্রোতে। হতভাগ্য আমি!
আমার জীবন সেই সমুদ্র-লহরী—
অবিচ্ছিন্ন! ভগবতি, তবু যদি তব
শুনিতে বাসনা, তবে বলিব এখন।
"অষ্টমবৎসর যবে,—এই দীপালোকে
মন্দির-বাহিরে যথা নাহি যায় দেখা,
অষ্টমবৎসর পূর্বে তেমতি আমার
নাহি চলে, ভগবতি, স্মৃতির নয়ন
শৈশব-প্রথম মম আচ্ছন্ন তমসে,—
অষ্টমবৎসর যবে, সমপাঠিগণ,
পাঠান্তে আনন্দে সবে 'মা-মা-মা' বলিয়া
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে যবে ছুটিত আলয়ে,
অর্ধপথে তাহাদের জননী যখন,
আদরে লইয়া কোলে, চুম্বিত বদন

সহস্র চুম্বনে; মাতৃস্নেহেতে গলিয়া
অর্ধশ্বাসে শিশুগণ পাঠবিবরণ
বলিত যখন;—মরি কি পবিত্র চিত্র!—
ভাবিতাম আমি,—হায়! এ জীবনে মম
প্রথম ভাবনা, হৃদয়-আকাশে [মোর],
স্বচ্ছ, সুনির্মল, এই প্রথম জলদ
হইল সঞ্চার,—ভাবিতাম আমি মনে
কোথায় জননী মম? কে দিবে উত্তর?
জিজ্ঞাসিলে জনকেরে কাঁদিতা নীরবে
পিতা; কাঁদিতা নীরবে বৃদ্ধা পিতামহী
মম; কাঁদিত শংকর—সহজ, সরল,—
জনক-প্রতিম বৃদ্ধ রক্ষক আমার,
হারাইনু যারে ওই তটিনী-সলিলে।
সকলে বলিত মাতা গিয়াছেন কাশী,
আসিবেন ফিরে পুনঃ কিছুদিন পরে।
"কিন্তু মম জননীর প্রেমের মুরতি
দেখিতাম, ভগবতি, শয়নে-স্বপনে।
সুদূর স্বপ্নের মতো, হায়! এবে যাহা
পড়ে কি না পড়ে মনে, হায় রে তখন
সেই দয়াময়ী মূর্তি, মানস-দর্পণে
আছিল অঙ্কিত। প্রতিদিন স্বপ্নে আমি
দেখিতাম, মাতা ম্লান মুখে দীনভাবে
বসিয়া শিয়রে মম, চুম্বিতে-চুম্বিতে,
নিষিক্ত করিতা ক্ষুদ্র বদন আমার
অশ্রুজলে। জননীর অশ্রু নিরখিয়া,
কাঁদিতাম স্বপ্নে আমি; বৃদ্ধা পিতামহী
ভাঙিতা স্বপন মম, লইতা হৃদয়ে
মুছি অশ্রু, কাঁদিতাম অর্ধরুদ্ধ স্বরে
আমি পিতামহী-বুকে!
"এই রূপে, হায়!
দুঃখের শৈশবকাল চলিল আমার।
ক্ষুদ্র বিষাদের স্রোত চলিল অদৃশ্যে
দুঃখার্ণবে;—অদৃষ্টের গতি দুর্নিবার!
শুনিয়াছি, হায় দেবি, মানব-জীবনে,
শৈশব সুখের কাল, বালেন্দু জ্যোৎস্না
হায় রে তমসা-নিশি অগ্রভাগে যেন।

বালার্ক-কিরণ কিংবা শারদ-প্রভাতে.
দিবস যাহার, হায়, অনন্ত দাহন'
সে সুখ-শৈশব মম আছিল আচ্ছন্ন
বিষাদ নীরদ-জালে—হতভাগ্য আমি'
যেই জননীর কোল, মায়ের সোহাগ,
জীবন-প্রথম করে এত মধুময়,—
এত সুখকর আহা,—ছিল না আমার।
সেইহেতু হায়! স্বতঃ নিরানন্দ চিত্ত
আছিল আমার। মম প্রতিবাসিগণ
বয়োধিক চিন্তাকুল ভাবিত আমারে
সেই হেতু; সেই হেতু আজি, ভগবতি
আমার শৈশব-স্মৃতি, মরুদৃশ্য যেন'
"এই মরু-পর্যটনে শংকর আমার
ছিল সুশীতল ছায়া; শান্তি-সরোবর;
নিত্য সহচর মম জাগ্রতে, নিদ্রায়'
পাঠ্যাভ্যাস শ্রম কিংবা শিক্ষকের জ্বালা
(শৈশবের বিভীষিকা!) ভুলিতাম আমি
শংকরের স্নেহে—স্নেহ পবিত্র, বিমল'
হায় রে পড়িলে মনে জননী আমার
কাশী-নিবাসিনী মাতা,—রাখিয়া মস্তক
বৃদ্ধ শংকরের বুকে, কাঁদিতাম আমি,
কত প্রবঞ্চনা-জালে অভাগা আমারে
হায় রে করিত শান্ত বলিব কেমনে?
"সুদূর পূরবে, দেবি, নিবাস আমার
জন্মভূমি রঙ্গমতী, 'কাঞ্চী* নদী-তীরে'
পার্বত্য প্রদেশ! পঞ্চাদশবর্ষ পূর্বে
অনিবার মহাযুদ্ধ মোগল-পাঠানে
একদিকে, অন্যদিকে দস্যু আরাকানী,
বারিচর পর্তুগিস সমুদ্র-তস্কর,—
এই নিষ্পেষণ-যন্ত্রে, পিতামহ মম
হয়ে নিষ্পেষিত, এই পূরব পর্বতে
লইয়া আশ্রয় বৃদ্ধ; ব্যাধ-ভয়ে যথা
নিরীহ কুরঙ্গ পশে নিবিড় কাননে।
"আশৈশব আমি এই বন-পর্যটন,
বিজন কানন-শান্তি, শোভা উদাসীন,
বাসিতাম ভালো, দেবি! শংকরের করে

* ইহাকে তৎপদেশে "কাইচা" বলে।

ধবি আনন্দিত মনে, ভ্রমিতাম বনে
বনে, দিনা-দ্বিপ্রহরে। যথা মহীরুহ,
বিশাল শ্যামল ছত্র—আতপ অভেদ্য—
ধরিয়া, পর্বত-শিরে আছে দাঁড়াইয়া;
সুশীতল ছায়াতলে, শংকরের কোলে
রাখিয়া মস্তক সুখে; শ্যামল, কোমল
স্নিগ্ধ দূর্বা-গালিচায় রাখি কলেবর;
প্রকৃতির মুক্ত শোভা দেখিতে-দেখিতে;
কহিতাম শংকরেরে পাঠ-বিবরণ,
আর কতশত কথা। শুনিতে-শুনিতে
শংকরের সুমধুর কাহিনী সরল
ক্রমে নেত্র মুদিতাম অজ্ঞাত নিদ্রায়।
"একদিন অপরাহ্নে, এইরূপে, দেবি,
বসিয়াছি দশভুজা-মন্দির সম্মুখে,
প্রশস্ত উপলখণ্ডে অতীব প্রাচীন
এক বটবৃক্ষ-তলে। বসিয়াছি সুখে
শিখরের প্রান্তভাগে; সম্মুখে আমাব
গিরিবর ভীম-অঙ্গ অর্ধচন্দ্রাকারে
দিয়াছে ঢালিয়া যেন নীল কাঞ্চীজলে।
পশ্চাতে মায়ের শ্বেত-প্রস্তর মন্দির;
মন্দিরের দুইপার্শ্বে শৈল অর্ধচন্দ্র
ব্যাপিয়া বঙ্কিম অঙ্গ—অরণ্যমণ্ডিত—
ছুটেছে পশ্চিমে। কটিদেশে প্রভাকর;
সুবর্ণ সুদীর্ঘ রশ্মি, তরুর বিচ্ছেদে
পশি বন-অন্তরালে, করিয়াছে হায়!
শ্যামল কাননশোভা কারুকার্যময়!
মন্দিরের পার্শ্বে বসি কুরঙ্গিণী মাতা
(দেবীর আশ্রিতা মৃগী) করিছে লেহন
সাদরে শিশুর অঙ্গ। আনন্দে শাবক
নাচিতেছে, ছুটিতেছে, ফিরিতেছে পুন
আনন্দে মায়ের বুকে নাচিয়া-নাচিয়া।
এই চিত্র, ভগবতি, দেখিতে-দেখিতে,
ভরিল অন্তর মাতৃপ্রেমে; হায়, দেবি,
ভাসিল নয়ন মম। কহিনু শংকরে—
'ওই দেখো মৃগশিশু মায়ের আদরে,
লভিছে কি সুখ আহা! জননী আমার,
কবে আসিবেন ফিরে, বলো না শংকর?'
আমারে লইয়া বুকে, কাঁদিতে-কাঁদিতে,

হায়! হতভাগ্য বৃদ্ধ লাগিল বলিতে—
'আর কতদিন, বাছা, প্রবঞ্চিব তোরে,
বাড়াব আশার তৃষা! বলিব সকল
আজি; হতভাগ্য তুই! পূর্ণ গর্ভবতী
জননী দুঃখিনী তোর, সপত্নী-যন্ত্রণা
না পারি সহিতে,—সর্ব-দুঃখ-সহনীয়
রমণী-জীবনে, এই সাপত্ন্য-কণ্টক
হায়! অসহ্য কেবল!—অভিমানে, ঘোর
তমিস্র নিশীথে, এই কানন-ভিতরে
প্রবেশিল অভাগিনী ত্যজিতে জীবন।
কি বলিব, দুঃখে, বাছা, ফেটে যায় বুক!
রজনী প্রভাতে যবে পূজক ব্রাহ্মণ,
কুলমাতা দশভুজা আসিল পূজিতে,
দেখিল জননী তোর, এই শিলাখণ্ডে
মূর্ছাগতা,—তুই তার বক্ষের উপরে।'
"নীরবিল বৃদ্ধ; দুই নয়নের ধারা
পড়িতে লাগিল বেগে মস্তকে আমার।
বিস্মিত নয়নে আমি রহিনু চাহিয়া
শংকরের মুখপানে, বহুক্ষণ পরে,
সম্বরিয়া অশ্রুধারা, আরম্ভিল পুন,—
'পঞ্চমবৎসর যবে, বীরেন্দ্র তোমার,
গেলা বারাণসী তব জননী দুঃখিনী,
অর্পিতে মানস-পূজা বিশ্বেশ্বর-পদে,
তব পিতৃব্যের সনে। কিছুদিন পরে,
আসিল ফিরিয়া ঘরে পিতৃব্য তোমার,
কিন্তু কোথা মাতা তব—চির-অভাগিনী?
মণিকর্ণিকার ঘাটে—জাহ্নবীর তীরে।'—
'শংকর! নাহি কি তবে জননী আমার?'—
শৈশব-হৃদয়ে, দেবি, না জানি কি ভাব
উপজিল, শেষ জ্যোতি হল নির্বাপণ
যেন, আঁধারিয়া মম হৃদয়-জগৎ।
কাঁদিলাম পড়ে মনে, কাঁদিল শংকর
চুম্বিয়া বদন মম; রহিল চাহিয়া
কুরঙ্গিণী সকরুণ সজল নয়নে
মম মুখপানে, ভুলি আপন শাবকে।
 সেইদিন হতে, মাতঃ হায়! কতদিন,—
কতদিন? বোধহয় প্রতিদিন, এই

পাষাণে রাখিয়া বুক, শিশুমতি আমি,
কাঁদিয়াছি স্মরি মম দুঃখিনী জননী,
জুড়ায়েছি মাতৃশোক পাষাণ-শীতলে।
কত কাঁদিয়াছি হায়! মম অশ্রুজলে
ভিজি, এই শিলাখণ্ড হয়েছিল যেন
সুকুসুম সুকুমার,—পাষাণ বলিয়া
আর হইত না জ্ঞান। কি বলিব, দেবি,
ভাবিতাম এ পাষাণ মাতৃকোল মম।
পাঠান্তে, মৃগয়া-অন্তে, এই শিলাসনে
করিতাম শ্রম-শান্তি, শুনিতে-শুনিতে
পত্রের মর্মর, বনবিহঙ্গের ধ্বনি—
মধুর অজ্ঞাত ভাষা। ভাবিতে-ভাবিতে,
দেখি, অর্ধ-স্মৃত, অর্ধ-বিস্মৃত বদন
জননীর, পড়িতাম ঘুমাইয়া। ছিল
শৈশবে আমার এই নিরেট পাষাণ,
শান্তি, সুখ, স্নেহ, দয়া, সর্বস্ব আমার।
"এই শিলাসনে এই পর্বত-শিখরে
এইরূপে ভাবিতেছি হায়! একদিন
অবসন্ন মনে। সন্ধ্যা-সন্তাপহারিণী
ছায়ার উপরে ছায়া, ছড়াইছে ক্রমে,—
ছায়া ক্রমে গাঢ়তর। গম্ভীরা প্রকৃতি
মূর্তি, শান্ত-সুশীতল! এই সন্ধ্যালোকে
জগতের দৃশ্য যত ধীরে অন্তর্হিত
ক্রমশ হইতে থাকে তিমির-ছায়ায়,
অন্তর-জগৎ ততো হয় ভাসমান।
যথা যত তমোময়ী হয় নিশীথিনী,
গৃহালোকরাশি ততো হয় সমুজ্জ্বল!
দেখিলাম, ভগবতি, অন্তর-জগৎ—
বাসনার রঙ্গভূমি! প্রকৃতি গাম্ভীর্যে
করিয়াছে হৃদয়েতে গাম্ভীর্য সঞ্চার।
একটি বাসনা-স্রোত বহিছে তথায়
গম্ভীরে। বাসনা?—মণিকর্ণিকার ঘাটে,
বসি জাহ্নবীর তীরে, পূত জাহ্নবীর
জলে, হায়! অশ্রুজলে, পূত ততোধিক
মাতৃস্নেহে বিগলিত, করিব তর্পণ।
মায়ের অন্তিম স্থান দেখি, একবার,
দুই বিন্দু অশ্রু তাহে করিব বর্ষণ।"

সৌরাষ্টক

ওঁ

পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে,
পবিত্র ভাস্কর ওঁ
নব-সমুদিত, বিশ্ব আলোকিত,-
নমো দিবাকর ওঁ।

২

জগৎ নয়ন, জগৎ জীবন,
জগৎ-ধারণ ওঁ।
জগৎ-পালন, জগৎ-ধ্বংসন,
নমস্তে তপন ওঁ!

৩

তোমার পরশে, ফুটে পুষ্পরাজি,
উপজে প্রস্তর ওঁ!
শোষে সিন্ধুনীর, বরষে বারিদ,—
নমো বিভাকর ওঁ!

৪

গ্রহ-উপগ্রহ, অনন্ত-অসংখ্য,
ভ্রমে নিরন্তর ওঁ!
বেষ্টিয়া তোমায়,— দাস-উপদাস,—
নমো প্রভাকর ওঁ!

৫

ঐন্দ্রজালিক— গোলক যেমন,
জ্যোতিষ্কমণ্ডল ওঁ!
ভ্রমে শত-শত, নাহি সংঘর্ষণ,
নমো কি কৌশল ওঁ!

৬

হেন সৌররাজ্য, করি আকর্ষণ
ভ্রম অনির্ঘাত ওঁ!
সহস্র যোজন মুহূর্তে-মুহূর্তে,–
নমো দিননাথ ওঁ!

৭

অনন্ত হইতে, ছুটিছ অনন্তে;
অনন্ত গরজে ওঁ!
অনন্ত শকতি, অনন্ত ভ্রমণ,
অনন্ত গৌরবে ওঁ!

৮

তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব-চরাচর ওঁ!
পাপ বিনাশিয়া লও পুণ্য-পথে,
নমো দিবাকর ওঁ!

আবার ধ্বনিল শঙ্খ। না হইতে লয়
কম্বুকণ্ঠ, কৃষ্ণকণ্ঠ উঠিল ভাসিয়া,—
তেমতি গগনস্পর্শী, তেমতি গভীর।

মহাষ্টক

ওঁ

পবিত্র গগনে, পবিত্র তপনে,
পবিত্র সাগরে ওঁ।
যাঁহার মহিমা, নিত্য বিভাসিত;—
নমো বিশ্বেশ্বর ওঁ!

২

ক্ষুদ্র সূর্য এই, গ্রহ-উপগ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম ওঁ।
ক্ষুদ্র বিম্ব তব অনন্ত সাগরে,—
নমো নারায়ণ ওঁ!

৩

শত-শত সূর্য, সৌররাজ্য শত
শত সংখ্যাতীত ওঁ।
ছুটিছে অনন্তে, অনন্ত বিদারি,—
নমশ্চিন্ত্যাতীত ওঁ!

৪

অনন্ত দিকেতে, অনন্ত গতিতে
নিত্য সঞ্চালিত ওঁ।
অনন্ত সংগীতে, অনন্ত প্লাবিত,-
নমো জ্ঞানাতীত ওঁ।

৫

অহো! কিবা দৃশ্য।— অনন্ত বসুধা,
অনন্ত ভাস্কর ওঁ।
অনন্ত নক্ষত্র, অনন্ত ঝলসি,
নমো জ্যোতিশ্বর ওঁ।

৬

দিবস যামিনী, হেমন্ত বসন্ত,
ঋতু বিপরীত ওঁ।
শূন্য বিচিত্রিয়া, নিত্য বিবাজিত,-
নমো কালাতীত ওঁ!

নিত্য রূপান্তর, নিত্য স্থানান্তর,
নিত্য গুণান্তর ওঁ
যার শক্তিবলে, বিশ্ব-চরাচর,—
নমো শক্তিশ্বর ওঁ!

ক্ষুদ্র পুষ্প-রেণু, প্রচণ্ড শিখর,
অনন্ত সাগর ওঁ,
যাঁহার অচিন্ত্য শকতি-দর্পণ,—
নমো মহেশ্বর ওঁ!

গম্ভীর ওঁকারধ্বনি প্লাবিল গগন,
ভাসিল সমুদ্র মন্ত্রে, উচ্ছ্বাসে-উচ্ছ্বাসে
ছুটিল তরঙ্গপৃষ্ঠে দিগ্‌দিগন্তরে।

ঊর্দ্ধে মহাশূন্যে, মহাজলধি-হৃদয়ে,
সেই মহাধ্বনিসহ শত শঙ্খধ্বনি,
ভাসিল সমুদ্রবাহী প্রভাত-অনিলে।
শঙ্খকণ্ঠ, সিন্ধুকণ্ঠ, নরকণ্ঠ মিলি,
সেই ধ্বনি, সেই ধ্যান, সে দৃশ্য মহান!—
অনন্ত অচিন্ত্যভাবে ভরিল হৃদয়।
ধ্যানান্তে দুর্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ,
কৃষ্ণার্জ্জুনে সম্ভাষিতে আসি ধীরে-ধীরে,
বেদির পশ্চাৎ হতে কহিলা মধুরে—
"হে কৃষ্ণ! দুর্বাসা ঋষি আশীর্বাদ করে।"
একচিত্তে কৃষ্ণার্জ্জুন চাহি সিন্ধুপানে,
আত্মহারা, চিন্তামগ্ন,— চেতনাবিহীন।

পঞ্চম সর্গ

অনুরাগ

রৈবতক শৃঙ্গে বিচিত্র কানন
বিচিত্র পাদপচয়,
স্বভাবে রোপিত স্বভাবে বর্ধিত,
স্বভাবের শোভাময়।
কোথায় তমাল, কোথায় বা তাল,
কোথায় অশ্বত্থ-বট;
ফল-বৃক্ষ নানা, ফুল-বৃক্ষসহ
সাজায়ে বিচিত্র পট।
কোথায় দীর্ঘিকা সরসী কোথায়,
নীল নভঃ অনুকারী।
ঝরিছে নির্জনে, মধুর নিক্কণে
কোথায় নির্ঝরবারি।
বন-অন্তরালে, পুষ্পের উদ্যান,
পুষ্পের উদ্যানে ঘর,
প্রস্তরে নির্মিত, কোথায় লতায়,
নিকুঞ্জ নিথর-থর।
শৃঙ্গ-প্রান্তভাগ লঙ্ঘনীয় যথা
শোভিছে তোরণ দৃঢ়;

শোভে মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাসাদ
গগন পরশি শির।
প্রাসাদ-পশ্চাতে একটি উদ্যানে,
একটি নিকুঞ্জে বসি,
সখী সুলোচনা গাঁথে ফুলমালা,—
মেঘমাখা মুখশশী।
শ্যামা সুলোচনা, মধ্যমযৌবনা
মধ্যম শরীবখানি;
লাবণ্য-মাধুরী অজ্ঞাতে কে চুরি,
কে যেন করিছে হানি।
কৈশোরে তাহার প্রেমের কলিকা
পড়েছে ঝরিয়া, বালা
শূন্য বৃন্ত বহে, শূন্য হৃদয়েতে
সহে সে কণ্টকজ্বালা।
নিরজনে যথা বসি একাকিনী
কপোত কূজনে নীড়ে,
নিকুঞ্জে বসিযা নিরজনে তথা
গাঁথে মালা গায় ধীরে।

গীত

১

ফুলের প্রণয়-ভাষা মরি কি মধুর রে!
আঁধারে-আঁধারে থাকি,
পাতায়-পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে শরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে, উহু বাজে তার মরমে!
কিবা নব-অনুরাগ কামিনী-কুসুমে রে!

২

প্রেমের কৈশোর ভাব রজনীগন্ধায় রে!
আঁধারে-আঁধারে থাকে,
আঁধারে লুকায়ে রাখে
শীতল সৌরভ-ভরা সুকোমল শরীরে;
কিন্তু সহে দরশন,
সুকোমল পরশন,

তোল তারে,—প্রেমভরে কাঁদিবেক শিশিরে।
প্রেমের কৈশোর ভাবা রজনীগন্ধায় রে!

৩

প্রেমের যৌবন দেখো বিকচ গোলাপে রে!
প্রীতিময়, প্রেমময়;
শোভাময়, সুধাময়;
ব্রীড়ার ঈষৎ হাসি ভাসিতেছে অধরে!
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে,
অতৃপ্ত বাসনা জাগে,
তথাপি কোমল প্রাণ, ঝড়বেগে ঝরে রে!
প্রেমের যৌবনভাব বিকচ গোলাপে রে।

৪

প্রেমের প্রৌঢ়তা মূর্ত্তি পদ্মিনী সুন্দরী রে!
সুখ-শান্তি স্বরূপিণী,
প্রীতিপূর্ণ সরোজিনী,
যৌবনসৌরভ আছে হৃদয়েতে লুকায়ে;
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়া নাই,
সেই চঞ্চলতা নাই,
প্রীতিপারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে,
ঝড়ে-বজ্রে নাহি টলে পদ্মিনী সুন্দরী রে!

৫

প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!
গলায়-গলায় থাকে,
হৃদয়ে-হৃদয়ে মাখে,
শয্যায় পড়িয়া থাকে অঙ্গে-অঙ্গে মিশিয়া,
বিরহতাপিত প্রাণে
কি যে শীতলতা আনে,
সুকোমল সৌরভেতে মন-প্রাণ মোহিয়া!
প্রেমের মিলন-সুখ মালতী কুসুমে রে!

৬

প্রেমের দুরাশা-ব্রতী ওই সূর্যমুখী রে!
কোথায় গগনে রবি,
প্রচণ্ড অনল-ছবি,
কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়া!

কি দুরাশা হৃদে বহে!
অনিমিষনেত্রে রহে,
যায় শুকাইয়া সেই রবিপানে চাহিয়া,
প্রেমের দুরাশা-ছবি ওই সূর্যমুখী রে!

৭

প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে!
আঁধারে-আঁধারে ফুটে,
আঁধারে ভূতলে লুঠে
কাঁদি সারা নিশি, পড়ি অশ্রুভারে ঝরিয়া।
মাটিতে রাখিয়া বুক,
জুড়ায় মনের দুখ,
আপন সৌরভে থাকে আপনিই মরিয়া;
প্রেমের বিধবা হায়! ওই শেফালিকা রে!

পশ্চাৎ হইতে কে আসি অজ্ঞাতে
নয়ন চাপিয়া ধরি,
রহিলা নীরবে, কহে সুলোচনা
হাসিয়া—"আ মরি! মরি!
হেন সুবাসিত, বিকচ গোলাপ,
কে বর্ষিতে পাবে আর,
বিনে সত্যভামা ফুলকুলেশ্বরী
কৃষ্ণ মুগ্ধ রূপে যার!"
ঠোন্‌কা মারি গালে, ভ্রূকুটি করিয়া,
বলিলা আসিয়া আগে—
"ঠাট্টা, পোড়ামুখী, গোলাপের কাঁটা
ফুটিতে কেমন লাগে?"
"তোর মাথা খাই, ঠাট্টা নহে দিদি,
সত্য বলি এইবার—
বিনে সত্যভামা, দুর্জয় মানিনী,
কৃষ্ণ মুগ্ধ মানে যার।"
সুন্দরী কাড়িয়া, লয়ে ফুলমালা,
বলিলা কৃত্রিম রাগে,—
"ছিঁড়ি ফুলমালা, দিব ফেলাইয়া
দেখিব লাগে না লাগে।"
হাসি সুলোচনা, কহিল তখন,

"সত্যভামা হার
গলায় যাহার
কি কাজ তাহার,
ফুলের মালা?
আছে, কোন্ ফুল
সাজাতে এমন,
ভূতলে অতুল রূপের ডালা।"

পুনঃ ঠোন্‌কা গালে পড়িল হঠাৎ,
বাড়িল দ্বিগুণ ক্রোধ,
বাড়িল সখীর হাসির তরঙ্গ,
হাসির নাহিকো রোধ।
বাম কর কক্ষে, দক্ষিণ করেতে
শোভিছে মোহিনী মালা,
মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী
কানন করিয়া আলা।
গৌরাঙ্গ-গৌরবে ঈষৎ রক্তিমা,—
তরুণ অরুণাভাস;
সুগোল বদন বালার্কমণ্ডলে
মহিমার পরকাশ।
বিলাস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে
মদালস দুই তারা;
যৌবন তরঙ্গ ছুটিয়া, ফাটিয়া,
অঙ্গে-অঙ্গে মাতোয়ারা।
ঈষৎ ফুলানো রক্তিম অধরে
বাসনা-সমুদ্র জাগে;
সুপ্ত ক্রোধানল, মানের ঝটিকা
সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগে।
ভুবন-মোহিনী দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখিছে সখীর হাসি;
হাসি-হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া,
দেখিছে রূপের রাশি।
"মারো দিদি মারো"— কহে সুলোচনা,—
মারো পুনঃ ধরি পায়;
রক্ত-শতদল, মরি! আরবার
লাগুক আমার গায়
যে কর পরশে রমণীর প্রাণে
এমন অমৃত ঢালে!

আলিঙ্গনে তার,		পুরুষের প্রাণে,
না জানি কি শিখা জ্বালে!"
মুখ-ভঙ্গিমায়,		করিয়া উৎসব,
স্থিরকণ্ঠে কহে রানী,—
"কাঁদ্‌ছিলি তুই		বল্‌ পোড়ামুখী,
তোর সব আমি জানি।
মিথ্যা যদি তুই		বলিবি আবার
নিশ্চয় খাইবি মার।"
"মিথ্যা তবে বলি,—		না দিদি এবার,
সত্য ভিন্ন নহে আব।
কর-কোকনদ		পরশে তোমার
যুগল নয়ন মম।
আনন্দে শিশিব,		কবিল বর্ষণ;—
ক্ষম, পায়ে পড়ি ক্ষম"—
দু-হাতে সাপটি		কেশরাশি-ভার
ধবিলা মহিষী পুনঃ—
"ছাড়ো দিদি ছাড়ো,		উহু বড় লাগে,
সত্য বলিতেছি শুনো।"
মুক্ত হল কেশ,		ধীবে সুলোচনা
বলিল ঈষৎ হাসি—
"সত্য-সত্য দিদি,		কাঁদিতেছিলাম,
কান্না বড় ভালোবাসি।"
"কিসের রোদন?"—		"মধুর প্রেমের।"
"কার প্রেম?"—"নাথ মম।"
"বালবিধবার, নাথ		কে আবার?"—
"হৃদয়েতে যেই জন।"
"অসম্ভব কথা,		বালিকা-হৃদয়ে
কেমনে রহিবে ছায়া?"
"নাহি ছিল দিদি!		কিন্তু তুমি হায়!
জানো না প্রেমের মায়া।
"বুঝিবে না তুমি		এ প্রেম আমার,
শরীরে বিমুগ্ধ তুমি;
"তোমার প্রলয়		বাসুদেব যদি
যান পঙ্কপদ ভূমি।
সম্মুখ সমরে		পড়িলেন পতি,—
এই স্মৃতি মম স্বামী।

এ চারিটি কথা শরীর তাহার,
তাহার অতুল মুখ!
জিনি কৃষ্ণার্জুন সে রূপ তাহার,
জুড়ায় আমার বুক।
সমস্ত শর্বরী সেই পতি মম
আমারে হৃদয়ে রাখে।
সমস্ত দিবস সেই পতি মম
আমার হৃদয়ে থাকে।
আমার এ প্রেমে মুহূর্ত বিরহ
নাহি ঘটে কদাচন।
নাহি উঠে প্রভু ঈর্ষার গরল;
মানের ঝটিকা-রণ।
আমার এ প্রেম শান্তি-পারাবার,
হৃদয় ভরিয়া যায়,"—
"মরো গিয়া তুমি, সেই পারাবারে
সত্যভামা নাহি চায়।
এল পোড়ামুখী বালিকা বিধবা
আমায় শিখাতে প্রেম,
আসিল কাঙাল দেখাতে ধনীরে
কাহাকে যে বলে হেম।
তরঙ্গ-বিহীন সে প্রেম কি প্রেম?–
ক্ষুদ্র সরসীর জল;
মহাপারাবারে কভু শান্তি, কভু
উত্তাল তরঙ্গদল।
শান্তি ঝটিকায়, আঁধারে জ্যোৎস্না,
জলদে বিজলি-খেলা,
নাহি যেই প্রেমে; না পারে যে প্রেম
প্লাবিয়া পর্বতবেলা
নিতে ভাসাইয়া তৃণের মতন,
উন্মত্ত সংসার করি;
না ছুটে বিদারি হৃদয়-ভূধর
গৈরিক মুরতি ধরি;
হাসিতে জ্যোৎস্না, ধাঁধিতে বিদ্যুৎ,
গর্জিতে অশনিপ্রায়,
না পারে যে প্রেমে, সেই তুচ্ছ প্রেম
সত্যভামা নাহি চায়।"

বলিয়া গরবে বসি গরবিনী
লাগিলা গাঁথিতে হার;
কিছুক্ষণ পরে, ধীরে সুলোচনা
আরম্ভিলা আরবার:—
"সত্যভামা-প্রেম বুঝি বা না বুঝি,—
বজর বিদ্যুৎ গাঁথা,
বুঝিয়াছি আমি আব একজন
খেয়েছে আপন মাথা।"

সত্যভামা। কে সে ছিন্নমস্তা?
সুলোচনা। ভদ্রা আমাব
স।
বুঝিয়াছ ভালো তবে।
সেই উদাসিনী? তারো প্রাণনাথ
চারিটি কথাই হবে।
সু।
কথা নহে দিদি, তার চিত্তচোর
সেই বীরচূড়ামণি।
স।
বাসুদেব তবে,— বিনে সেই চোর
বীর কারে নাহি গণি।
সু।
বাসুদেব বীর! ও সংবাদ, দিদি,
কোথায় পাইলে তুমি?
সেইদিন সেই অস্ত্র-অভিনয়,
ভুলিলে সে রঙ্গভূমি?
তব বাসুদেব দাঁড়াইয়া পাশে
ছিলা ফেল্-ফেল্ চেয়ে;
"ধন্য ধনঞ্জয়"— যবে বারম্বার
উঠিল আকাশ ছেয়ে।
বাঘিনীর মতো পড়ি বক্ষে তার
সখীরে ভূতলে ফেলি,
"ছোটো মুখে তোর, এত বড়ো কথা।"
বলিলা চরণে ঠেলি।
"ছাড়্, দিদি ছাড়্, তোর মাথা খাই,
এমন কব না আর"—

বলে সুলোচনা হাসিতে-হাসিতে
বাঁধিল কেশের ভার।

স।
বল্ তবে তুই বুঝিলি কেমনে,
সুভদ্রার অনুরাগ?

সু।
বুঝ তুমি কিসে বীণায় আমার
বাজে কি রাগিণী রাগ?

স।
বুঝিয়াছি অহো! বুঝাবি আমায়
কোকিলের কুহু-স্বনে,—
তাহাও তো নাই, দুরন্ত শরতে
গেছে মলয়ের সনে!
ভ্রমর-গুঞ্জনে, কুসুম-কাননে,
বলিবি ভদ্রার জ্ঞান
যায় হারাইয়া পদ্মপত্রে শুয়ে
জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
অন্ন নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
দিবানিশি কাঁদে বসি;
জ্যোৎস্না দেখিলে, উহু-উহু বলে,
বরন হয়েছে মসী।
পড়িছে খসিয়া প্রকোষ্ঠ-বলয়,
বিশুষ্ক অধর-দল,
না যতনে আর পশুপক্ষিগণে,
নাহি দেয় বিন্দু-জল।

সু।
এ সব লক্ষণ নহে সুভদ্রার
ছাড় উপহাস, বলি,—
নিশ্চয় জানিও ফোট-ফোট-ফোট
ভদ্রার প্রণয়-কলি।
সেই উদাসীন নয়ন তাহার
নহে লক্ষ্যহীন আর;
অথচ সে লক্ষ্য চাহে লুকাইতে
অন্তরে-অন্তরে তার।
ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ নীলিমা
নয়ন-তারায় ভাসে,

ব্রীড়ার ঈষৎ ঈষৎ রক্তিমা
অধরকোণায় হাসে।
কি যেন হয়েছে কোমলতা আরো,
সন্ধ্যার কোমল মুখে;
কি যেন কি ভাব, কোমলতা আরো,
হয়েছে সন্ধ্যার বুকে।
ফুট-ফুট-ফুট কমল-কলিতে
পড়েছে অরুণাভাস,
স্থির সিন্ধু-জলে হয়েছে ঈষৎ
জ্যোৎস্নার পরকাশ।
বরঞ্চ অধিক যতনে সুভদ্রা
আপনার পক্ষিগুলি,
দিতেছে আহার, কিন্তু চেয়ে দেখো
কি যেন ভাবিছে ভুলি।
কোমলতাময় মুরতি তাহার
হয়েছে কোমলতর,—
যাই আমি তারে আনিব এখনি,
মুহূর্ত অপেক্ষা করো'
ছুটিল রমণী, বারিভরা মেঘ
ছুটিল পবনে যথা;
মুহূর্তেক পরে হাসিতে-হাসিতে
ফিরিয়া আসিল তথা।
পশ্চাতে সুভদ্রা, ক্ষুদ্র দুই কর
বাঁধা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে,
হাসি সুলোচনা চোরের মতন
টানিয়া আনিছে বলে।
"জয় মহারাজ, অখণ্ড-প্রতাপ!"—
নমি বামা ভূমিতলে,
কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল,—
"নিবেদি চরণতলে—
রাজপ্রাসাদের, রুদ্ধ এক কক্ষে
নির্জনে বসিয়া চোর,
করিতেছে চুরি, ধরিয়াছি আমি,
পুরস্কার হোক মোর।
চোরা ধন-সহ আনিয়াছি চোর,
হউক বিচার তার!

সত্যভামা রাজ্যে হয় হেন চুরি,
স্বয়ং কৃষ্ণ চোর যার!"
অঞ্চল হইতে চিত্রপট এক
দিল সত্যভামাকরে;
মহিষীর মুখ হইল গম্ভীর,
চলিলা আপন ঘরে।
"ছবি,—ছবিখানি,— দিয়ে যাও দিদি"—
সুভদ্রা বলিলা ডাকি।
ফণিনীর মতো মুখ ফিরাইয়া,—
"ভদ্রা হেন ছবি আঁকি,
চাহিস আবার নিতে ফিরাইয়া,"—
বলিলা মহিষী রোষে,
"দেখাবো ভ্রাতারে ভগিনীর গুণ,
গেলো কুল তোর দোষে!"
বলে সুলোচনা,— "সাধু পুরস্কার
নাহি এই ভূমণ্ডলে";
চলিল গাইয়া আপনার মালা
পরিয়া আপন গলে।

গীত

ফুলের প্রণয় ভাষা মরি কি মধুর রে!
আঁধারে-আঁধারে থাকি,
পাতায়-পাতায় ঢাকি,
আপনার মনে ফুটি মরে থাকে শরমে;
হৃদয়ে সৌরভ আছে,
পাবে যদি যাও কাছে,
ছুঁইলে ঝরিবে উহু! বাজে তার মরমে,
কিবা নব-অনুরাগ কামিনী-কুসুমে রে!

সপ্তদশ সর্গ

মহাভারত

১

সুপ্ত রৈবতক-অঙ্কে সচন্দ্র শর্বরী
নিদ্রা যায়, পরকাশি
মৃদু সুখ-স্বপ্ন হাসি
নিরমল জ্যোৎস্নায়, চুম্বি মনোহর
পুরোদ্যানে ফুটোম্মুখ পুষ্প থরে-থর।
এখনো সে ফুলবনে
ফাল্গুনি নিরজনে,—
নাহি নিশীথিনী জ্ঞান, রৈবতক-মতো
শান্তির জ্যোৎস্নাময় হৃদয় তাহার
শান্ত, স্থির, সমুজ্জ্বল;
মেঘ-ছায়া সুকোমল
ঈষৎ মিশায়ে চিন্তা, করিয়াছে বিকাশ
সুখের তরঙ্গে মৃদু বিষাদ-উচ্ছ্বাস।

২

প্রমত্ত তটিনী-তটে তরু ভগ্ন-মূল
ছিলা পার্থ দাঁড়াইয়া;
পর্বত-প্রবাহ ছিল রুদ্ধ ক্ষুদ্র শৈলে;
ভেবেছিলা মনে
বসি সুভদ্রার পার্শ্বে প্রণত ভূতলে,
নারায়ণ-পদে করি আত্ম-সমর্পণ,
রহিবেন স্থির-ব্রত,
এই রৈবতক-মতো;
একটি তরঙ্গে,
সত্যভামা সেই তরু ফেলিলা উপাড়ি,
দিলা উড়াইয়া শিলা একই নিশ্বাসে।

৩

নিশ্চয় এখন তরু যাইবে ভাসিয়া,
নাহি সাধ্য দাঁড়াইবে।
নিশ্চয় প্রবাহ এবে যাইবে ছুটিয়া,
কার সাধ্য ফিরাইবে?

হরিতে হইবে ভদ্রা,—পরিণাম তার?
এইখানে জ্যোৎস্নায় ছায়ার সঞ্চার!
অপ্রীত কি নারায়ণ
হইবেন? তাঁর মন
জানে না কি সত্যভামা? অসম্ভব নয়।
তাঁহার ইঙ্গিত আছে নাহিকো সংশয়।
অথবা রমণী-প্রাণ,
চঞ্চলতা মূর্তিমান;
তাহাতে যে বেগবতী হৃদয়-রানীর!—
হল জ্যোৎস্নায় ছায়া দ্বিগুণ গভীর।
এইরূপে
শারদ আকাশ-মতো ফাল্গুনি-হৃদয়ে
কখনো ভাসিছে মেঘ; কখনো জ্যোৎস্না
হাসিতেছে মেঘান্তরে;
কভু ছায়া গাঢ়তর; কভু সুখ-হাসি
ফুল্ল প্রেম-চন্দ্রালোক,—সুখ-স্বপ্নরাশি।

৪

বাজিল কালের কণ্ঠ, শ্যেন পক্ষিচয়
শৃঙ্গে-শৃঙ্গে বৃক্ষচূড়ে সুপ্ত চরাচর
প্লাবিয়া ঘোষিত,—নিশি দ্বিতীয় প্রহর?
চমকিয়া ধনঞ্জয় চলিলা আবাসে
অন্যমনে; অন্যমনে কর-পরশনে
খুলিল নীরবে এক কক্ষের দুয়ার।
এ কি কক্ষ? এ তো নহে আবাস তাঁহার!
এ কি কক্ষ? নহে ইহা দৃষ্ট-পূর্ব তাঁর!
দেখিলা বিস্ময়ে পার্থ শোভিছে প্রাচীরে
নানারূপ মানচিত্র, চিত্র নানারূপ।
শোভে কক্ষে স্থানে-স্থানে গ্রন্থ রাশি-রাশি
সুবাসিত দীপালোকে; স্তবকে-স্তবকে
শোভিতেছে স্থানে-স্থানে পুষ্প সুবাসিত।
দীপগন্ধ, ধূপগন্ধ, কুসুমসৌরভ,
বহি মুক্ত-দ্বার-পথে মোহিল পাণ্ডব।
এ কি কক্ষ? সব্যসাচী ভাবিলেন মনে
কি যেন মহান তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানাতীত,
সেইসব মানচিত্রে আছে প্রকটিত।

কি যেন গভীর কথা, সেই চিত্রাবলী
কহিতেছে জ্ঞানাতীত, নীরবে সকলি।
গ্রন্থে-গ্রন্থে অতীতের মনস্বী-সকল
মূর্তিমান কক্ষে, যেন সবিতৃমণ্ডল।
এ কি কক্ষ? অতীতের অনন্ত আলয়!
দেখিলা ফাল্গুনি, যেন নিবিড় তিমিরে
দাঁড়াইয়া স্থানে-স্থানে নক্ষত্রের মতো
অমর মানবগণ। মধ্যস্থলে তার
ও কি মূর্তি! ও কি জ্যোতি! কিরণপ্রবাহ!
অতীতের গ্রহগণ করি বিমলিন,
প্লাবি বর্তমান, যেন জ্যোতি নিরমল
আলোকিছে ভবিষ্যৎ, অনন্ত, অসীম।
কক্ষকেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণ বসি যোগাসনে
সমাধিস্থ, সংজ্ঞা-শূন্য দেব-অবয়ব
শোভিতেছে যেন সিন্ধু নিষ্কম্প-নীরব।
সমাধিস্থ চরাচর। বাতায়নপথে
কেবল বহিছে ধীরে নিশীথসমীর
নীরবে ভকতিভরে, কেবল আলোক
নীরবে ভকতিভরে কাঁপিছে ঈষৎ।
সকলি নীরব-স্থির, পার্থের হৃদয়
হইল ভক্তিতে পূর্ণ পবিত্রতাময়।
ভীত ধনঞ্জয় যেন কার্য তস্করের
করেছেন আসি এই পবিত্র মন্দিরে,
করেছেন কলুষিত, এ পবিত্র ধাম
পদপরশনে তাঁর, নিশ্বাসসমীরে।
ভাবিলেন মনে-মনে যাইবেন চলি
কৃষ্ণের অজ্ঞাতে—সেও কার্য তস্করের!
রহিবেন দাঁড়াইয়া অজ্ঞাতে যোগীর—
সেও তস্করের কার্য! দেখিতে-দেখিতে
যোগীর শরীরে যেন জীবনসঞ্চার
হইতেছে ধীরে-ধীরে, কাঁপিতেছে ধীরে
সেই প্রসারিত বক্ষ, শান্ত সরোবরে
বহিছে হিল্লোল যেন অতি ধীরে-ধীরে।
গোবিন্দ মেলিলা আঁখি; কি যেন কি আভা
ভাসি সেই চক্ষে পুনঃ গেল মিশাইয়া।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ, বড়ো প্রীতি-মাখা
সেই হাসি, ডাকিলেন—"সখে ধনঞ্জয়!"

সভয়ে-সম্ভ্রমে পার্থ হয়ে অগ্রসর
হইলা প্রণত পদে, সাদরে কেশব
বসাইয়া পার্থে কাছে অজিন আসনে
বলিতে লাগিলা প্রীত সস্মিত বদনে—
"অতীত নিশার্ধ, সখে, কেন এতক্ষণ
রহিয়াছ অনিদ্রিত? সুপ্ত চরাচর
নিদ্রার কোমল অঙ্কে।"
অর্জুন। বসিয়া উদ্যানে
দেখিতেছিলাম, দেব, রৈবতক-শোভা
মনোহর চন্দ্রালোকে। অজ্ঞাতে কেমনে
বহিল শর্বরী-স্রোত, ফিরিতে আলয়ে
ভ্রমে প্রবেশিয়া এই পবিত্র নিবাস,
তীর্থধাম করিয়াছে কলুষিত দাস।
কৃষ্ণ। এই আত্মগ্লানি, সখে, মহত্ত্ব তোমার।
অপূর্ব বীরত্বে, দেবচরিত্রে যাহার,
পুণ্যবান ধরাধাম, এ কি গ্লানি তব!
থাকুক কৃষ্ণের কক্ষ, বক্ষও তাহার
হয় পবিত্রিত দেহপরশে তোমার।
নহে ভ্রম, নারায়ণ আনিলা হেথায়
তোমায় ফাল্গুনি। তব রৈবতকবাস
হইতেছে শেষ, তবে আইস দুজনে
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয়,
পবিত্র সলিল-মতো, করি প্রক্ষালন
নারায়ণ-পাদপদ্ম, নিরখি তাহাতে
আমাদের কি নিয়তি রয়েছে অঙ্কিত।
পারিয়াছ সেই লেখা পড়িতে কি তুমি?
অর্জুন। না, দেব; অধম আমি পাইব কোথায়
সেই তত্ত্ব-জ্ঞান-নেত্র, দয়া করি দাসে
নাহি দাও যদি তুমি, সহস্রকিরণ
নাহি দেন দীপ্তি যদি, পাইবে কোথায়
আলোক স্ফটিক-খণ্ড? নিয়তি তাহার
এইমাত্র জানে দাস—যথা ক্ষুদ্র স্রোত
অবিরাম বেগে ক্ষুদ্র জীবন তাহার
অনন্ত সিন্ধুর পদে ঢালে, নরোত্তম,
তেমতি এ দাস ক্ষুদ্র জীবন তাহার
ঢালিবে অশ্রান্ত ওই পদ-পারাবারে,—

জগৎ-জীবন-সিন্ধু,—ততোধিক আর
নাহি জানে ধনঞ্জয় নিয়তি তাহার।
কৃষ্ণ। সংসার সমুদ্র, পার্থ; আমরা মানব
অনন্ত সমুদ্র-যাত্রী, জ্ঞান ধ্রুবতারা;
গম্যস্থান সুখধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম;
অনন্ত তাহার পথ; জ্ঞান ধ্রুবলোকে
আপন নিয়তিপথ, আপনার কর্মব্রত,
যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু-পদে নিরবাণ।
বিশ্বরাজ্য করো দৃষ্টি,
সর্বত্র সার্থক সৃষ্টি,
কিবা কীট, কি পতঙ্গ, উদ্ভিদ, সলিল,
আকাশ, নক্ষত্র, ক্ষিতি, অনল, অনিল।
সেই অর্থ মূলধর্ম
তাহার সাধন-কর্ম,
যার যত উচ্চ শক্তি, ততো গুরুতর
কর্ম তার, দেখো সাক্ষী খদ্যোত ভাস্কর।
এ বীরত্ব দুরলভ,
অতুল মহত্ত্ব তব,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে, জননী ভারত,—
রয়েছে মহত্ত্বপূর্ণ তব কর্মব্রত।
দেখ ফিরাইয়া মুখ, দক্ষিণ প্রাচীরে
কি দেখিছ ধনঞ্জয়?
অর্জুন। ক্ষুদ্র দেশ-চিত্রচয়।
কৃষ্ণ। মগধ, মিথিলা, চেদী, অযোধ্যা, হস্তিনা,
বিদর্ভ, বিরাট, সিন্ধু, মথুরা, গান্ধার,
অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল,—
চেয়ে দেখ মহাবল
পূরব প্রাচীরে—
অর্জুন। সিন্ধু ভূধর-মালায়
সুরক্ষিত মহাদেশ,—অনন্ত বিস্তার!
যেন সসাগরা ধরা,
সরিৎভূধরাম্বরা,—
প্রকৃতির মহারাজ!
কৃষ্ণ। দেখ, মহারথ,
পুণ্যভূমি আমাদের জননী ভারত।

একদিকে করো দৃষ্টি
স্রষ্টার বিপুল সৃষ্টি,
অতুল সাম্রাজ্য, অন্যদিকে, ধনঞ্জয়,
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয়।
পশ্চিমে চাহিয়া দেখো—
অর্জুন। কি ভীষণ চিত্র এক!
অসংখ্য গৃধিনী,—কিম্বা বিকটদর্শন!—
কেবা সে দেবী, গোবিন্দ,
—কিবা মুখ-অরবিন্দ!—
খণ্ড-খণ্ড করি যারে শকুন নির্মম,
কেহ হস্ত, কেহ পদ, করিছে ভক্ষণ?
বিঁধিতেছে পরস্পরে
কি হিংসা কটাক্ষশরে!
একে অন্যগ্রাস যেন লইবে কাড়িয়া,
একে অন্যে আক্রমণ
করিতেছে ঘন-ঘন,
কিবা পাকসাট! কিবা চিৎকার ভীষণ!
পশিতেছে কর্ণে যেন আকুলিয়া মন!
ছিন্ন নারী-অঙ্গ, হায়,
তবু কিবা মহিমায়
বিমণ্ডিত বরবপু! সহস্র ধারায়,
ছুটিতেছে অঙ্গে-অঙ্গে কি শোণিত হায়।
কি করুণা মুখে তাঁর!
দেখিতে না পারি আর,—
পেতেছি হৃদয়ে, দেব, দারুণ আঘাত!
এ কি চিত্র,—কে সে নারী,—কহো, নরনাথ?
কৃষ্ণ। চিত্র ভারতের, পার্থ, আর্যলক্ষ্মী দেবী।
খণ্ড দেহ, খণ্ড দেশ;
দেখ গৃধ্রনির্বিশেষ
ভারত-নৃপতিগ্রাম! দেখো দুর্বিষহ
বর্তমান ভারতের চিত্র শোকাবহ!
হায় মা!—(তিতিল নেত্র,
প্রীতির পবিত্র ক্ষেত্র)
হায় মা! ধরিয়া কিবা মূর্তি ভয়ংকরী,
করে খড়্গ, দানবের সদ্য ছিন্ন শির,
রণরঙ্গে উন্মাদিনী,
মুণ্ডমালা-বিশোভিনী,

দানবের মহাকাল দলি পদতলে,
'মহাকালী' ক্রোধে মহামেঘস্বরূপিণী—
বিজলি শোণিতধারা,
ঘোরারাবী, ধ্বংসকারা,
দলিয়া দানব-বল নৃশংস দুর্জয়,
সত্যযুগে পুত্রগণে দিলা বরাভয়।
সিন্ধুগর্ভে বিতাড়িত
করি পুনঃ শিরোত্থিত
ত্রেতায় অনার্যশক্তি, প্রতিহিংসাপর
ভারত দক্ষিণাপথে বাড়াইলে কর,
আবার মা রণরঙ্গে
ডুবালে সিন্ধুতরঙ্গে,
অনার্যের-অধর্মের শেষ অভ্যুত্থান,
নাচিলে আনন্দে, তারা, তারিয়ে সন্তান।
অনার্যের ধর্ম-শব
পড়িয়া চরণে তব,
শিরে অর্ধচন্দ্র মালা, করে কুবলয়!—
সত্যযুগে রণমূর্তি, ত্রেতায় বিজয়!
দ্বাপরে বল তারিণী
এরূপে আত্ম-ঘাতিনী
হইবে কি? মা! আমরা যত কুলাঙ্গার,
বিফলিব দু-যুগের শ্রম কি তোমার?
না না, দেখ, বীরবর,
উত্তর প্রাচীরোপর
"রাজরাজেশ্বরী" মাতা, সম্রাজ্ঞী-রূপিণী!
শিরে ধর্ম-সুধাকর,
শোভে পঞ্চভূতোপর
জননীর রাজাসন; দূর রণশ্রম,—
হইয়াছে জননীর অরুণবরন।
পাশাঙ্কুর ধনুঃশর,
দেখা কিবা মনোহর
সম্রাজ্ঞীর সমরাস্ত্র, রাজ্য প্রহরণ
চারিদিক চারি ভুজে শোভিছে কেমনে!
ত্রিকাল ত্রিনেত্রে ভাসি,
অধরে প্রীতির হাসি,
পার্থ! জগন্মাতা-রূপ, দেখো নেত্র ভরি,
"মহাভারতের" চিত্র "রাজরাজেশ্বরী!"

স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ,
দেখিলেন দুইজন,
সে চিত্র মহিমাময়; চারিটি নয়ন
ভক্তিভরে অচঞ্চল করিল দর্শন।
অর্জুন। এ মহারহস্য জ্ঞান
হয় নাই, ভগবান,
এ মূঢ় দাসের তব; কহ দয়া করি,
কহ কি অভীষ্ট তব,
এই খণ্ড রাজ্য-সব
ধ্বংসিয়া, সাম্রাজ্য এক করিবে স্থাপিত,
আবার ভারত রক্তে করিয়া প্লাবিত?
কৃষ্ণ। সমর সর্বত্র পাপ নহে, ধনঞ্জয়!
রক্ষিতে দশের ধর্ম,
নহে পার্থ, পাপকর্ম
একের বিনাশ। পার্থ! নিষ্কাম সমর,—
নাহি ততোধিক আর পুণ্য শ্রেষ্ঠতর।
দেখো সখে, সৃষ্টি রাজ্য,
স্বয়ং স্রষ্টার কার্য,
দেখো তাহে ধ্বংসনীতি অলঙ্ঘ্য কেমন!
সাধিতে সৃষ্টির তত্ত্ব
প্রতিকূল, কি অশক্ত
যেইজন; ধ্বংস তার ঘটিছে তখন;
কি রহস্য! মৃত্যু এই জগৎ-জীবন!
কি ছার নৃপতি শত!
স্রষ্টার মঙ্গল-ব্রত,
বিফলি, কোটির সুখে হইবে কণ্টক;
পবিত্র ভারত-ভূমি করিবে নরক।
অর্জুন। ধ্বংসনীতি প্রকৃতির
যদি, দেব, সত্য স্থির,
প্রকৃতি রক্ষিবে তবে নীতি আপনার,
আমাদের তাহাতে কি আছে অধিকার?
কৃষ্ণ। ফুটিলে কণ্টক দেহে,
নির্গত করিতে কি হে
সে কণ্টক, আমাদের নাহি অধিকার?
ধর্ম যাহা মানবের,
ধর্ম তাহা সমাজের;

—যেই বারিবিন্দু, সখে! সেই পারাবার.
সমাজ কণ্টক তথা করিবে উদ্ধার।
অন্যথা কণ্টক বিষ,
যেন তাঁর আশীবিষ
কবিবেক জর্জরিত সমাজ-শরীর
অচিরে পড়িবে গ্রাসে সে ধ্বংস-নীতির।
অর্জুন। সমাজ কণ্টক;—কিসে পাব পরিচয়?
কৃষ্ণ। শরীর কণ্টক যাতে জানো, ধনঞ্জয়!
মানব-শরীরে ব্যথা,
সমাজ-শরীরে তথা,
অশান্তি ও অবনতি,—জ্বলন্ত যেমন
দেখিছ সর্বত্র, পার্থ, ভারতে এখন।
অর্জুন। কিন্তু হেন নরমেধ যজ্ঞ বিভীষণ,
দয়াময়! হেন রণ
করিবে কি সংঘটন?
কৃষ্ণ। বরং নিবাব সেই ভীষণ বিগ্রহ,
হইতেছে প্রধূমিত যাহা অহরহ।
গৃহ-ভেদ, জাতি-ভেদ,
রাজ্য-ভেদ, ধর্ম-ভেদ,
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বালিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্যজাতি!
চাহি আমি বক্ষপাতি
নিবারিতে সে বিপ্লব। বাসনা আমার
চির-শান্তি; নহে, সখে, সমর দুর্বার।
যেই রাজ্য অসিধারে
সৃজিত, সে পারাবারে
বালির বন্ধন ক্ষুদ্র; মানব-হৃদয়
কার সাধ্য অসিধারে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি-ধর্ম, ধনঞ্জয়, নহে পশুবল।
অর্জুন। ভীষণ শার্দূলগণে,
নাহি বিনাশিলে রণে,

শান্তিতে সাম্রাজ্য, দেব, হবে কি স্থাপিত?
কৃষ্ণ। উপায় মায়ের চিত্রে রয়েছে লিখিত।
বাঁধি ধর্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব মর্ম;—
এক জাতি, এক ধর্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।
পাশাঙ্কুশে যদি, পার্থ,
সাধিতে এ পরমার্থ
নাহি পারি, জননীর আছে ধনুঃশর,
প্রবেশিব ধর্মরণে নিষ্কাম অন্তরে।
যুদ্ধ পাপ ঘোরতর
যতক্ষণ বীরবর
থাকে অন্যপথ ধর্ম করিতে পালন;
নিরুপায়ে, বীরব্রত পুণ্য-প্রস্রবণ।
অর্জুন। ধর্ম তবে বলি কারে?
নরহত্যা ধর্ম? ধর্ম-কর্ম বা কেমন,
দাসে দয়া করি কহ কংসনিসূদন!
কৃষ্ণ। যাহাতে ধারণ যার
সেই, পার্থ, ধর্ম তার;
যেই নীতিচক্র করে জগৎ ধারণ,
সেই জগতের ধর্ম চক্র সুদর্শন।
তার সূক্ষ্ম অঙ্গমাত্র,
মানবের ধর্মশাস্ত্র;
ওই নীতিচক্র কার্য অশ্রান্ত জগতে
তিলেক নাহিকো সাধ্য তিষ্ঠি কোনোমতে।
উন্নতি কি অবনতি,—
জগতের এ নিয়তি;
ধর্ম-কর্ম,—নীতিশিক্ষা, নীতির সাধন,
কর্মফল নিয়ন্তায় করি সমর্পণ।
আর্যসমাজের গতি
আজি ঘোর অবনতি
নীতির লঙ্ঘন পাপে; আইস দুজন,
ধরার এ পাপভার করিব মোচন।

অর্জুন। জ্ঞানাতীত নারায়ণ,—
কর্মফল সমর্পণ
কেমনে করিব, দেব, চরণে তাঁহার?
কৃষ্ণ। জননীর ওই চিত্র দেখো আর-বার।
বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা,
পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা,
—পঞ্চভূতময় সৃষ্টি,—সর্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান।
পার্থ! সর্ব-ভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম,—ধর্ম, পুণ্যফল তার
হয় সর্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার।
অর্জুন। কি উদ্দেশ্য এ ধর্মের?
কৃষ্ণ। সখে, মোক্ষ-সুখ।
বিষ্ণু সর্ব-ভূতময়,
জন্ম-মৃত্যু কিছু নয়,
জলবিন্দু জলে জন্মে, জলে হয় লয়।
'সোঽহং' সংগীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়।
জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা,—
সকলে জগতসুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান!
অন্যথা সকলে, পার্থ,
সাধে যদি নিজ স্বার্থ,
কি পশুত্বে পরিণত হইবে মানব,
আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত, পাণ্ডব।
অর্জুন। তবে যাগ-যজ্ঞ সব
নহে ধর্ম, হে কেশব?
কৃষ্ণ। নহে পূর্ণ ধর্ম, যদি না হয় নিষ্কাম,
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম-জ্ঞানের সোপান।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
অপূর্ণ মানব-মন,
অপূর্ণে পূর্ণের জ্ঞান, অন্তে অনন্তের,—
দুরূহ তপস্যাসাধ্য।
অনন্ত সে বিশ্বারাধ্য,—
পূজিয়া অনন্ত মূর্তি অনন্ত শক্তির,
লভিবে বিভক্তি হতে জ্ঞান সমষ্টির।

দেখো ওই নীলাকাশ,
অনন্তের কি আভাস!
নাহি সাধ্য পূর্ণমূর্তি করি দরশন।
যার সাধ্য যতটুক
দেখি সে অনন্ত মুখ
লভি যথা, ধনঞ্জয় আকাশের জ্ঞান,
যাগ-যজ্ঞ তথা পার্থ পূর্ণব্রহ্ম-ধ্যান।
অর্জুন। এ মহানিষ্কাম ধর্ম জগতে প্রচার
যদি মহাব্রত তব,
কি কাজ, মহানুভব,
ভারত সাম্রাজ্যে তবে? যে রাজ্য তোমার,
ক্ষুদ্র নররাজ্য তার কাছে কোন্ ছার।
কৃষ্ণ। যতদিন খণ্ড-রাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য-
জাতি খণ্ড-খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়,
রহিবে সমাজ-ভেদে ধর্ম ভেদময়।
ফল-ফুল ভিন্ন যথা,
তরু ভিন্ন হবে তথা,
প্রকৃতির এই নীতি; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়।
করে ধর্ম-বিভিন্নতা যথায়-তথায়।
এক ধর্ম, এক জাতি,
একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য, নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
ততোদিন হিংসানল,
হায়! এই হলাহল,
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত;
আর্য জাতি, আর্য নাম, হবে স্বপ্নবৎ।
ধর্ম ভিত্তি নাহি যার,
বালিতে নির্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপভারে
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙি কাল-পারাবারে।
তেমতি, হে মহাবল,
সমাজ-সাম্রাজ্য-বল
নাহি যে ধর্মের, তাহা হবে না প্রচার,
নহে সত্ত্বগুণে মাত্র সৃজিত সংসার।

পবত্র নিষ্কাম ধর্ম,
তুমি কি তাহার মর্ম,
বুঝিয়াছ, করিয়াছ, সে ধর্ম গ্রহণ?
অর্জুন। করিয়াছি,—লইয়াছি চরণে শরণ।
কৃষ্ণ। দেখো তবে, মহারথ,
তোমার কর্তব্যপথ,
জননীর ওই চিত্রে অঙ্কিত সুন্দর,
ততোধিক নর-ব্রত নাহি মহত্তর।
এসো, মিলি দুইজন
করি আত্ম-সমর্পণ
এই কর্তব্যের স্রোতে, যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।
এক ধর্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম-রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।
ধনঞ্জয় ভক্তিভরে,
কৃষ্ণের চরণ করে
পরশিয়া কহিলেন, প্রণত ভূতলে—
"কি সাধ্য, পুরুষোত্তম,
আমি ক্ষুদ্র কীটোপম,
একটি ত্রিদিব আমি করিব সৃজন!
নাহি জানি কিবা ধর্ম,
অনাদি-অনন্ত ব্রহ্ম,
জানি এইমাত্র,—তুমি নর-নারায়ণ
জানি ধর্ম,—তব পদে আত্ম-সমর্পণ।"
ভাসি অশ্রু-প্রীতি-নীরে,
নারায়ণ ফাল্গুনিরে
কহিলেন প্রীতিভরে শান্ত-অবিচল,—
"এতদিনে মনে লয়,
বুঝিলাম নিঃসংশয়
মহর্ষি গর্গের সেই ভবিষ্যদ্বাণী।

দুটি নদী অর্ধপথে,
মিলি মাগো এইমতে,
অদৃষ্টের পারাবারে চলিল বহিয়া,
তব ওই মূর্তি-ধ্যানে হৃদয় ভরিয়া!"
কিছুক্ষণ দুইজন
করিলেন দর্শন,
জননীর সেই মূর্তি, সজল-নয়ন,
কহিলেন গদ-গদ স্বরে জনার্দন।—
"সব্যসাচী! সন্ধ্যাকালে
উদ্যানের অন্তরালে
বসি সুভদ্রার সহ, করিলে জ্ঞাপন
যেই হৃদয়ের ভাষা,
যেই হৃদয়ের আশা,
যোগবলে শুনিয়াছি আমি শক্তিমান!
আশীর্বাদ করি হও পূর্ণমনস্কাম।
প্রভাতে অরুণোদয়
হবে যবে, ধনঞ্জয়,
দারুক জোগাবে রথ, যাবে মৃগয়ায়—"
(লুকাইল মৃদু হাসি অধর-কোনায়।)
"রজনী বহিয়া যায়,
চিন্তা-অবসন্ন কায়
করগে বিশ্রাম, সখে, কালি জগন্নাথ
করিবেন আমাদের জীবন-প্রভাত।"
সে মৃগয়া, সেই মৃদু হাসি মনোহর
বুঝিলেন ধনঞ্জয়।
বন্দি পদকুবলয়
চলিলেন নিজ কক্ষে, নীলাকাশে আর
নাহি মেঘ, কিবা হাসি ফুল্ল-চন্দ্রিকার!

পঞ্চদশ সর্গ

বীরের শোক

ভারতের—জগতের—এবে অবসান
মহাদিবা!—কি শোকের কি সুখের দিন!
মানব-পবিত্রকারী এই মহাশোক;
এইশোক মানবের সুখের সোপান।
অবসান? না-না, এই দিবসের নাহি
অবসান। ব্যাপি চারিযুগ, মহাকাল
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন, এই দিবালোক
জ্বলিতেছে, জ্বলিবেক;—ঘোর অন্ধকার
কাননের পথে ফুল্ল-জ্যোৎস্নার হার!
সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে-ধীরে; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত, ভাবাক্রান্ত রথীর হৃদয়।
কিন্তু সারথির সেই প্রশান্ত হৃদয়ে,
প্রশান্ত ললাট-স্বর্গে, নাহি সেই ছায়া।
পড়ে মেঘ-ছায়া ক্ষুদ্র বক্ষে সরসীর;
অতল জলধিবক্ষে যায় মিশাইয়া।
'হা কেশব! এ ছিল কি নিয়তি আমার!"—
বাষ্প-গদগদকণ্ঠে কহিলা ফাল্গুনি,—
তব নারায়ণী সেনা, অতুল জগতে,
এরূপে অর্জুন হায়! করিবে সংহার!
সত্য, দেব দ্বৈপায়ন! বুঝিনু আবার—
মানুষের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অপার!"
"বৃথা অনুতাপ পার্থ!" প্রশান্ত বদনে
উত্তরিলা নারায়ণ,—"সেনা নারায়ণী
সাধিবারে নারায়ণ-কার্য ধরাতলে
হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ-কার্য
এই দীর্ঘকাল, আজি জলবিম্বরাশি

মিশাইল মহাজলে ইচ্ছায় তাঁহার;—
গাণ্ডীবী গাণ্ডীবমাত্র করেছে তাঁহার।
এখনও বুঝিলে নাকি, ধ্বংস ক্ষত্রিয়ের,
কৌরব-পাণ্ডব সেনা, সেনা নারায়ণী,
ইচ্ছা তাঁর। অধর্মের যেই মহাবিষে
ক্ষত্রিয়ের রক্ত-মাংস-মজ্জা জর্জরিত,
কার সাধ্য সেই বিষ করিবে উদ্ধার?
এখনও বুঝিলে নাকি, হায়! ক্ষত্রিয়ের
ধ্বংস বিনা ধর্মরাজ্য হবে না স্থাপিত;
নিম্ববৃক্ষে আম্র নাহি ফলিবে নিশ্চিত।"
ধীরে চলিয়াছে রথ। নাহি ক্ষুদ্র পথ
কুরুক্ষেত্রে; মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানবশবে,—দৃশ্য করুণার।
কেহ বা নিদ্রিত যেন, প্রশান্ত বদন,—
কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটি, ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে, মুষ্টিবদ্ধ কর,—
কেহ দন্তে তৃণ কাটি, আলিঙ্গি বসুধা—
পড়ে আছে স্থানে-স্থানে শোণিত-কর্দমে।
কারো অস্ত্রক্ষতে হায়! ঝলকে-ঝলকে
এখনও শোণিতধারা বহিতেছে বেগে
অঙ্গে-অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিঁধিয়া।
জীবিত-আহত কোথা করি নিষ্পেষিত
ছুটিতেছে-পড়িতেছে ক্ষিপ্ত অশ্ব-গজ
অঙ্গহীন শত-শত, পূরি রণস্থল
ভীম-নাদে মৃত্যুমুখে! কোথায় আহত
শত-শত চাহিতেছে উঠিতে, চলিতে,
—হস্তহীন, পদহীন, ছিন্নকলেবর,—
করিতেছে হাহাকার ব্যথায় ব্যাকুল।
ছিন্নহস্তে-পদে-শিরে, কবন্ধ শরীরে,
ভগ্ন রথে, ভগ্ন অস্ত্রে, মৃত অশ্ব-গজে,
আচ্ছন্ন সমরক্ষেত্র ক্রোশ-ক্রোশান্তর।
শকুনি, গৃধিনী, কাক, শৃগাল, কুকুর
করি ঘোর কোলাহল করিছে ভক্ষণ
অভিন্ন জীবিতে-মৃতে। সায়াহ্ন-গগনে
আহতের আর্তনাদ,—ভিক্ষা করুণার,
হিংস্র পশু-পক্ষিদের ঘোর কোলাহল,

ভীষণ চিৎকার ক্ষত গজ-তুরঙ্গের,
মিশি এক ঘোর রবে, কণ্ঠে প্রলয়ের
উঠিছে কি হাহাকার! কিবা হাহাকার
সায়াহ্নের সমীরণে যাইছে ভাসিয়া!
অবতরি স্থানে-স্থানে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
আহতের ক্ষতে করি অমৃত সিঞ্চন,
করি মুমূর্ষুর প্রাণে শান্তি বরিষণ,
চলিলেন অশ্রুজলে প্লাবিয়া বদন।
সর্বত্র আহতগণ জিজ্ঞাসে ডাকিয়া—
"আজি কোথা আমাদের সুভদ্রা জননী?
যন্ত্রণায় যায় প্রাণ।" কহিলেন পার্থ—
"কেন আজি সুভদ্রার সেবক, সেবিকা,
সৈন্য-চিকিৎসক-সহ, না দেখি, কেশব!
রণস্থলে? প্রাণ বড়ো হয়েছে আকুল,
সত্বর শিবিরে চলো, আসিব ফিরিয়া
সুভদ্রার সহ পুনঃ। কি যে ঘোর রণ,
ধ্বংসের ভীষণ ক্রীড়া, হইয়াছে আজি!—
না পারি দেখিতে আর। পাণ্ডবসৈন্যের
এই দশা! নাহি জানি সৈন্যে কৌরবের
হইয়াছে অস্ত্রে মম কি দশা ভীষণ!"
চলিতে লাগিল রথ। বসি অন্যমনা
উভয় সারথি, রথী; অজ্ঞাতে কেমনে
পড়িয়াছে চক্র এক দেহে অচেতন,—
অভাগা করুণ কণ্ঠে করিল চিৎকার।
পড়িলেন ভূমিতলে, লইলেন তুলি
রথে পুনঃ—অচেতন দেহ অভাগার।
"কৌরব সে"—সৈন্য কেহ কহিল বিস্ময়ে।
প্রেম-অশ্রু-পূর্ণ মুখে, কণ্ঠে করুণার
কহিলেন কৃষ্ণ—"ভাই! শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা, যুদ্ধ অন্তে ভাই পাণ্ডবের।
ঝটিকায় যে তরঙ্গ উত্তাল-ফেনিল
মহাদ্বন্দ্বী, ঝটিকান্তে অভিন্ন সলিল।"
আবার চলিল রথ। নীরব উভয়
রহিলেন কিছুক্ষণ। কি অজ্ঞাত শোকে
দুইটি হৃদয় যেন আচ্ছন্ন, অচল।
সাশ্রুকণ্ঠে কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয়

কহিলা—"কেশব! কেন হৃদয় আমার
ভীত আজি, মরু-সম বিশুষ্ক বদন,
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, অবসন্ন প্রাণ?
বুঝিয়াছি নিঃক্ষত্রিয় করিতে জগৎ
জন্ম মম। করিয়াছি আত্মীয় বিনাশ
সে নিয়তি অনুসরি ত্রয়োদশ দিন;—
হয় নাই প্রাণ মম কাতর এমন।
কি যে অমঙ্গল-ধ্বনি বাজিছে শ্রবণে,
অদূর মরুর যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস
তৃষ্ণাতুর অবসন্ন পথিকের কানে!
কি যে অমঙ্গল-দৃশ্য মনের নয়নে
ভাসিতেছে, অবসন্ন নেত্রে পথিকের
অনন্ত উত্তপ্ত যেন মরু-বিভীষণ!
চক্রব্যূহ করি, হায়! দুর্বিজয় দ্রোণ
করিলা কি ধর্মরাজে বন্দী আজি রণে?
কিংবা অভিমন্যু তব আছে তো কুশলে?
দেখিতে তাহার মুখ, প্রীতি-পুষ্পবন,
আজি কেন প্রাণ মম কাতর এমন?"
চাপি অমঙ্গল-চিন্তা স্থিরকণ্ঠে ধীরে
কহিলেন বাসুদেব,—"আছেন কুশলে
ধনঞ্জয়। মহারাজ অমাত্য সহিত।
দুর্ভাবনা করো দূর। মঙ্গল-নিদান
করিবেন তোমাদের অজস্র কল্যাণ।"
উত্তীর্ণ সমরক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিলা অদূরে
দুইজনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন-শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—"কেশব!
বাজে না মঙ্গলতূরী, দুন্দুভি, পটহ;
নীরব মুরজ-বীণা। পরাভবি সংশপ্তক
আসিতেছি, কই—নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল-সংগীত।
পুর-নারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরের দেয় হুলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ। কই পুত্রগণ

কই অভিমন্যু কই, আসে না ছুটিয়া
প্রীতিপূর্ণ মুখে করি প্রীতি-সম্ভাষণ।
নারায়ণ!"—অর্জ্জুনের ভিজিল নয়ন,—
"পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরজন!"
চক্রব্যূহ মহাক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহাদুর্গের মতোন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জনস্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক স্রোতে সেই দুর্গপানে,—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেইদিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ! চক্রব্যূহ করি
আজি যুঝিলেন দ্রোণ; সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখো কি ভীষণ।
স্তরে-স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর,—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীর-মতো শোভিছে কেমন!
কোন্ বীরমণি আজি জগৎ-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্তিমালা পরিল গলায়!
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন।"
আর চলিল না রথ; পড়িলা ভূতলে
লম্ফ দিয়া দুইজন; করিয়া লঙ্ঘন
ঊর্দ্ধশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিয়া সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডবসৈন্য, ঊর্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথী-মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি রত্নাকরতলে।
বাণবিদ্ধ মীন-মতো পাণ্ডব-সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি; স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ।
কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু, শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু! ক্ষত কলেবর

রক্তজবা সমাবৃত; সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল,—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার-সহ ছিন্না ব্রততীর মতো।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহাশোকক্ষেত্রে; কেবল অচল
এই মহাশোকক্ষেত্রে একটি হৃদয়;—
সেই নেত্র, সেই বুক, মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব-বক্ষে প্রীতির প্রতিমা!
নীরব-বিস্তৃত ক্ষেত্র। থাকিয়া-থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীবে মায়ের অধর
গাহিতেছে কৃষ্ণনাম। মূর্চ্ছিত অর্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জুন! অর্জুন!
আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
একবিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি,
বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝংকার।"

মুহূর্তে আগ্নেয়গিরি হইল কম্পিত।
হইয়া বিদীর্ণ তবে, মুহূর্ত বর্ষিয়া
তরল শোকাগ্নি, বেগে বর্ষিতে লাগিল
বজ্রানল কুরুক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
"অসি! অসি!"—বেগে অসি করি নিষ্কোষিত,
—বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরি বর্ষিল গৈরিক,—
"বসাইব কার বুকে কহো মহারাজ?
অর্জুনেরে পুত্রহীন কে করিল বলো?—
প্রহারিল এই বজ্র হৃদয়ে তাহার?
কেশব, পার্থের, আহা! দেবী সুভদ্রার
হৃদয় বিকীর্ণ করি, হৃদয়ের ধন
কে হরিল এইরূপে? দেব-প্রতিভায়,

বিক্রমে, মাহাত্ম্যে, জ্ঞানে, অভিমন্যু মম
কেশবের সমকক্ষ, রথি গণনায়
আমার অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্থগুণে;
হেন মহাবাহু পুত্রে কে জিনিল রণে?
ওই দেখো ভূপতিত আদিত্যের মতো
মণ্ডিত কিরণজালে, শোভে পুত্র মম
বিমণ্ডিত শরজালে। সস্মিত বদনে
কুঞ্চিত কেশান্ত মৃদু, ভ্রূ-যুগ বঙ্কিম,
স্থির-নিমীলিত মৃগ-শাবক-নয়ন,
সমুন্নত কলেবর শালবৃক্ষ-সম,
মৃত্যুর ছায়ায় দেখো শোভিছে কেমন!
সুদর্শন-সংরক্ষিত অমৃতভাণ্ডাব
হরিল কি মৃত্যু আজি? হা পুত্র আমার!
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরী,
মৃত্যু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার!
জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্বাহ্নে অস্ত? কবিতা জ্যোৎস্না
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সংগীতের বীণা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে?
প্রকৃতির অতুলিতা তুলি বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র প্রথম আভাসে?
হায়! মাতঃ বসুন্ধরে! প্রকৃতি-জননি!
ক্ষত্রিয়ের কুল-লক্ষ্মী! এ দারুণ শোক
তোমরা পার্থের মতো সহিবে কেমনে?
উঠ বৎস! উঠ! না-না, নাহি মৃত্যু তোর।
দেবীপুত্র তুই বাছা, ভাগিনা দেবের,
দেবশিশু তুই, ওরে করিতে প্রচার
জগতে দেবত্ব তোর জন্ম ধরাতলে।
দেবতার নাহি মৃত্যু। উঠ বৎস! উঠ!
অচেতনা দেবী মাতা বসিয়া শিয়রে;
অভাগিনী সুলোচনা বক্ষে অচেতনা;
অচেতনা পদতলে আনন্দপ্রতিমা
আমার উত্তরা বধূ। নিজে নারায়ণ
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তোর, মৃত্যুঞ্জয় হরি,—
কি সাধ্য আসিবে মৃত্যু নিকটে রে তোর!

উঠ বৎস! উঠ! এই পাপ ধরাতলে
এখনও তো ধর্মরাজ্য হয়নি স্থাপিত।
মানব-উদ্ধার বৎস! হয়নি সাধিত।
উঠ বৎস! উঠ! চলো, পিতাপুত্র মিলি
এখনি পশিব রণে, নির্শীথ আহবে
বিনাশিয়া কুরুকুল, অধর্ম-খাণ্ডব
পোড়াইয়া অস্ত্রানলে,—ভীষণ কানন,—
ধর্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে করিব স্থাপিত।
বাজাও সমরবাদ্য! সাজো সৈন্যগণ!
চলো সখে! পিতাপুত্র আজি একরথে
যুঝিব, নাসিব শত্রু; করিব স্থাপিত
ধর্মরাজ্য; উদ্ধারিব নর নিপতিত।"

শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় যাইতে ছুটিয়া
আস্ফালি গাণ্ডীব-অসি, ধরিলা কেশব,—
জ্ঞানবক্ষে শোকাবেগ হইল রোধিত।
"এই বিশ্ব লীলাভূমি"—গদ-গদ স্বরে
কহিলেন নারায়ণ,—"বিশ্বনিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান,
করি ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে-নিবিছে দীপ আলোকিযা গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি কার্য গৃহস্থের,—
আলোক প্রদান, পার্থ! নিয়তি দীপের।
আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।
আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার।
জন্মিতেছি, মরিতেছি, নিয়তি আমার।
পালিতেছি এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরে
নারায়ণ-লীলাভূমে, ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহালীলাযন্ত্রে, নিয়তি পালন
সুখ মম, ঘোর শোক নিয়তি লঙ্ঘন,—
ধনঞ্জয়! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার।
দেখো বৎস সাধি বীর-নিয়তি তাহার
মানব-উদ্ধার ব্রতে, ব্রতে নিয়ন্তার,
লভিয়াছে সুখ-নিদ্রা কোলে জননীর
শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী। নহে শোক-অশ্রু,
ধনঞ্জয়! আনন্দাশ্রু করো বরিষণ।

তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রা'প,
সার্থক জীবন। আজি ধন্য জগতের
দুই মহাকুল। দুই শক্তি-স্রোতস্বতী
অভিমন্যু বীরদর্পে করি সম্মিলিত,
করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত!
করো শোক পরিহার! করি অনুসার
চলো এই মহামতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে, দুইজনে লভি নিবারণ।"
ধনঞ্জয় শোকাবেগ করি সম্বরণ
পুত্র-সারথির পানে চাহি জিজ্ঞাসিলা—
"কহো সূত! কোন্ মতে করি মহারণ
লভিল এ মহাশয্যা কুমার আমার?"
"ও কি দেখা যায়!"—ত্রস্তে কহিলা সারথি,
চমকিল শ্রোতাগণ আতঙ্কে-বিস্ময়ে—
"ও কি দেখা যায় ওই স্থির, বিভীষণ!—
চতুরঙ্গে বিনির্মিত, অস্ত্রে ঝলসিত,
কণ্টকিত যেন ঘন অটবী-সজ্জিত,
ভাস্কর-প্রদীপ্ত দূর-অদ্রি-শ্রেণী-মতো।
ও কি চক্রব্যূহ? মনে মানিয়া বিস্ময়
কহিনু,—"কুমার! হায়! লঙ্ঘিবে কেমনে
—এখনও বালক তুমি, এ ব্যূহ ভীষণ।"
হাসিয়া কেশরি-শিশু কহিলা নির্ভয়ে—
'খেলিয়াছি এতদিন, করি নাই রণ।'
আজি সবিস্ময় সূত! দেখিবে জগৎ
"অর্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের।"
কালের প্রস্তরবক্ষে আজি অসিধারে
লিখিব কৌরব-রক্তে অমর অক্ষরে,—
অর্জুনের পুত্র আমি, শিষ্য গোবিন্দের।
লইলা রথের রশ্মি করে আপনার,
ইরম্মদ বেগে রথে ছুটিল তখন।
দেখিলাম বজ্রাঘাতে মহাশৈলমালা
হয় যথা বিচূর্ণিত, হইল চূর্ণিত
কুমারের অস্ত্রে চক্রব্যূহের প্রাচীর।
বিদারিয়া হুহুঙ্কারে শৈল অবরোধ
ছুটি যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে,
ফেনিল তরঙ্গে সিন্ধু করি প্রকম্পিত,

মুহূর্তে বিদারি চক্রব্যূহ পরাক্রমে,
উড়াইয়া মহাবেগে, তৃণ-মুষ্টি-মতো,
মত্ত করি সিন্ধুরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
পশিল কুমার কুরু-সৈন্যের সাগরে
উৎক্ষোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত।
বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর।
শোভিতেছে চক্রাকারে চতুরঙ্গবেলা
মাতঙ্গে, তুরঙ্গে, রথে, সৈন্যে স্তরে-স্তরে,
আচ্ছন্ন আয়ুধারণ্যে, ধ্বজ-পতাকায়
ঝলসি মার্তণ্ড করে বনরাজিনীলা।
বহির্মুখ অন্তর্মুখে সৈন্য দুইমুখে
সুসজ্জিত; মহাবনে শৈলশৃঙ্গ-মতো
মহারথে মহারথী দর্পে স্থানে-স্থানে
রক্ষিতেছে মহাব্যূহ; হইতেছে রণ
বহির্ভাগে ঘোরতর, হইতেছে আর
পাণ্ডবের হাহাকারে বিদীর্ণ গগন।
মুহূর্তে অন্তর-সিন্ধু নীরব-নিশ্চল।
মুহূর্তে কুমার-বীর্য প্রভঞ্জন দর্পে
বহিল জলধিগর্ভে, জলধি-নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয়শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি
শত-শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়।
কৌরবের সৈন্যারণ্যে উঠিল জ্বলিয়া
হুহুঙ্কারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের;
কৌরবের হাহাকারে ছাইল গগন।
দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বৃহদ্বল, দুঃশাসন, শল্য—একে-একে
করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্ছিত,
পলাইল বার-বার শৃগালের মতো।
কৌরব-দুর্গতি দেখি কুমার লক্ষ্মণ
পশিলে আহবে, হাসি সুভদ্রা-নন্দন
কহিলা ডাকিয়া স্নেহে,—'ভাই রে লক্ষ্মণ।
আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র নহে এ প্রাঙ্গণ।
পিতার দুলাল তুমি, আদরে পালিত
সুখের শয্যায়, শত সম্ভোগের কোলে।
যে অনল দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,
না পারি সহিতে গেল পলাইয়া ত্রাসে

বার-বার, তুমি ভাই ননীর পুতুল
কেন ঝাঁপ দিলে সেই ঘোর দাবানলে?
কেন তাত দুর্যোধন এইরূপে হায়!
করিছেন আত্মঘাতী ক্ষত্রিয়-জগৎ?
বিপুলা পৃথিবী,—ক্ষুদ্র ক্ষীণজীবী নর;
বিপুল কৌরব-রাজ্য; কৌরব-পাণ্ডব
দুইভাই; এ দুয়ের হয় না কি স্থান
এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে দুদিনের তরে?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার-আমার,—
তুমি ভানুমতি-পুত্র, আমি সুভদ্রার।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে, গলাগলি করি
থাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা,
পারিব থাকিতে, স্বর্গে ইন্দ্রের মতন,
মাতা ভানুমতী-অঙ্কে, মাতা সুভদ্রার।
যাও সেই স্বর্গে, যাও শিবিরে তোমার।'
'ওরে দুরাচার! এত আস্পর্ধা রে তোর!'
গর্জিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে তেয়াগিলা শর।
অনিচ্ছায়, অযতনে, কুমার তখন
তেয়াগিলা প্রতি-অস্ত্র। কাটি অর্ধপথে
লক্ষ্মণের শর, খেলি অগ্নি প্রতিঘাতে,
ছুটিল আয়ুধ দীপ্ত বিদ্যুতের মতো।
ডাকিয়া কুমার ত্রাসে,—'সম্বর লক্ষ্মণ!'
না পারিল সম্বরিতে দেখিলা যখন,
আঁখি নাহি পালটিতে কাটিতে সে শর
আপনি দ্বিতীয় অস্ত্র করিলা প্রেরণ।
প্রবেশিল পূর্বশর লক্ষ্মণ-গ্রীবায়
যে মুহূর্তে, সে মুহূর্তে নিল উড়াইয়া
সে শর দ্বিতীয় শরে—কি শিক্ষাকৌশল!—
তবু ছিন্নগ্রীব ভূমে পড়িলা লক্ষ্মণ।
এক লম্ফে রথ হতে পড়িয়া ভূতলে
কে যায় ছুটিয়া ওই?—পার্থ! পুত্র তব।
পড়িলা লক্ষ্মণ-বক্ষে, শক্তিশেলে হত
লক্ষ্মণের বক্ষে যেন পড়িলা শ্রীরাম।
'লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! ভাই! প্রাণের লক্ষ্মণ!'—
শোকেতে অধীর শিশু কহিলা কাঁদিয়া,—
'লও এই অসি ভাই! হানো এই বুকে,

দুইভাই একসঙ্গে যাইব রে চলি,
একবৃন্তে দুইফুল ফুটিব ত্রিদিবে
নারায়ণপদতলে।' মুছাইয়া অশ্রু,
মৃত্যু-মুখে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলা লক্ষ্মণ—
'না-না, ভাই অভিমন্যু! থাকো তুমি ভাই!
নারায়ণপদতলে ফুটিয়া এখানে
পবিত্রিয়া পিতৃকুল, মোহিয়া জগৎ!
হায়! যেই পাপানলে ভস্মিছে কৌরব,
ভস্মিছে ক্ষত্রিয় জাতি, একটি পল্লব
নাহি ছোঁয় যেন তব,—এই ভিক্ষা চাহে
নারায়ণপদতলে মুমূর্ষু লক্ষ্মণ।'
কুরুক্ষেত্র শোকক্ষেত্র। কিন্তু শোকতর
দৃশ্য আরো ছিল ভাগ্যে ভাবিনি তখন।
বর্ষিল শোকের বর্ষা; জীমূত গর্জনে
গর্জি দুঃশাসন আসি কহিল গর্জিয়া,—
'ওরে কাপুরুষগণ! এখনও কি তোরা
রেখেছিস এই পুত্রহন্তায় জীবিত?
যা রে দুরাচার শিশু! যা রে রথে তোর,
লক্ষ্মণের সঙ্গী তুই হইবি এখন।'
আবার বাজিল রণ। দম্ভোলি-দর্শন
ছুটিল আয়ুধরাশি। মুহূর্তেক পরে
নির্বাপিত বজ্রমতো গেল লুকাইয়া
সংজ্ঞাহীন দুঃশাসন। একে, একে, একে,
সপ্ত মহারথী পুনঃ পশিলা সংগ্রামে।
গর্জিয়া কহিলা কর্ণ,—'কাপুরুষ-সুত!
পিতা তোর নপুংসক করিয়া আশ্রয়
করে রণ লজ্জাহীন; তোর রণসাধ
বড় হাস্যকর। শুধু স্নেহেতে কেবল
এতক্ষণ তোর আমি রেখেছি জীবন।
যা চলি এখন আমি দিলাম অভয়।'
'তাত কর্ণ!'—হাসি শিশু কহিল উত্তর,—
'বড় দুঃখ, এ স্নেহের দিতে প্রতিদান
অশক্ত এ ক্ষুদ্র শিশু। হইলে নিধন
তোমরা আমার অস্ত্রে স্নেহ-বিনিময়ে,
হবে পিতা পিতৃব্যের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,—
তাই পলায়ন-পথ উন্মুক্ত এমন।

নাশিব না তরু আমি; কিন্তু শাখাগণ
তোমাদের করো রক্ষা,—পারিলে না হায়!
রক্ষিতে লক্ষ্মণে কেহ। দিতেছি প্রথম
পিতৃনিন্দুকের দণ্ড, কর সংবরণ।'
ছুটিল কর্ণিক অস্ত্র কাকপক্ষময়,
ফুটিয়া কর্ণের কর্ণে অলক্ষিত বেগে
রহিল ঝুলিয়া,—শল্য উঠিল হাসিয়া;
অন্য অস্ত্রে কর্ণানুজ পড়িল ভূতলে।
শল্যানুজ এইরূপে শল্যের সম্মুখে
হইল পতিত; শেষে হইল পতিত
মহারথী বৃহদ্বল; ছয় রথী আর
সিন্ধু-বেলা প্রতিহত লহরীর মতো,
দেখিলাম ক্রমে-ক্রমে গেল লুকাইয়া।
তখন ব্যূহিত সৈন্যে, ধনু বীরেন্দ্রের
বর্ষিতে লাগিল মৃত্যু বরিষার মতো,
পড়িল কৌরবসৈন্যে মহা হাহাকার।
নিরুপায় সপ্ত রথী একত্রে তখন
—ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে?—
আক্রমিল একমাত্র শিশু অসহায়,
আক্রমে নিষাদগণে শার্দূল যেমতি
জালাবদ্ধ,—বসুন্ধরে! যাও রসাতল!
কর্ণ কাটিলেন ধনু;—অশ্ব ভোজরাজ।
ছিন্নধনু, রথহীন, খড়্গ-চর্ম ধরি
রথ হতে লম্ফ দিয়া পড়িলে ভূতলে
শত্রুমধ্যে, মেঘমধ্যে ক্ষিপ্ত সিংহ যথা,—
দ্রোণ অসি, কর্ণ-চর্ম, ফেলিলা কাটিয়া।
তখন ধরিয়া চক্র, চক্রধর-মতো
শোভিল কুমার তব। কাটিয়া অরাতি
আসিছে ফিরিয়া চক্র করে কুমারের
মুহুর্মুহু, খেলা করি বিদ্যুতের মতো।
বরষি অজস্র শর সপ্ত রথী মিলি
কাটিলা সে মহাচক্র, বিঁধিলা শরীর
বীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন। সেই বীরশোভা,
পুষ্পিত কিংশুক-সম বিক্ষত মুরতি,
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ, আরক্ত নয়ন
আকর্ণ বিস্তৃত, ঊর্ধ্ব ধৃত-চক্র বাহু

সপ্তরথি-সম্বেষ্টিত সে নির্ভীক রণ,
ঘন-ঘন সিংহনাদ, ঘোর অট্টহাসি,
যে দেখেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের
ভুলিবে না ইহজন্মে। ছিন্নচক্র, শিশু
তখন লইয়া গদা, গদাধর-মতো
ছুটিল, পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাত্মজ
রথ হতে তিনলম্ফে গেল পলাইয়া।
সুবলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গান্ধার,
রথী সপ্তদশ, দশ মাতঙ্গ বিনাশি,
চূর্ণ কর অশ্ব-রথ সারথি-সহিত
দুঃশাসনতনয়ের, গদাযুদ্ধে ঘোর
গদাঘাতে দুইজন পড়িলা ভূতলে।
না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্ন প্রাণ
রণশ্রমে, রক্তস্রাবে,—দুঃশাসনসুত
—ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,—
প্রহারিল গদা অর্ধ-উত্থিত মস্তকে,—
ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।
'অধর্ম! অধর্ম! ঘোর'—ঘোর হাহাকার
জলধি-কল্লোল-মতো উঠিল চৌদিকে।
অধোমুখে সপ্ত রথী ফিরিলা শিবিরে,—
রাধেয় মূর্চ্ছিত রথে। নিক্ষেপিয়া দূরে
কুরুসৈন্য অস্ত্র-শস্ত্র, মুমূর্ষু বেড়িয়া
করিতে লাগিল শোকে অশ্রু বরিষণ।
কহিলা কুমার—'সূত! ললাটে আমার
লেখো হৃদয়ের রক্তে, শরের জিহ্বায়,
কৃষ্ণার্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার,
লেখো বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।'
খুলিলাম শিরস্ত্রাণ, ছিঁড়ি উরস্ত্রাণ
'লিখিলাম,—হায়! লেখা যাইতেছে ভাসি
অশ্রুজলে লেখকের। চাহি ঊর্ধ্বপানে
প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, গাইতে-গাইতে
পুণ্য নামচতুষ্টয়, কহিতে-কহিতে—
'নারায়ণ—ধর্মরাজ্য—পতিত উদ্ধার,'
শুনিতে-শুনিতে—'জয়! অভিমন্যু জয়!'—
অনন্ত কৌরবকণ্ঠে, মুদিল নয়ন,
ঘুমাইল শিশু যেন কোলে জননীর;—
দেখিলাম দুই রবি গেল অস্তাচলে।

দেখো এই বীরশয্যা; এই দেখো আর
মৃত-চক্র-ব্যূহ কিবা বীরত্ব অপার!
দেখো ক্ষত-কলেবর তব সারথির।
পুত্র-সারথির দেখো অক্ষত শরীর!"
"অদ্ভুত! অদ্ভুত কথা! এ নহে সম্ভব।
পুত্রের যে এ বীরত্ব পিতার দুর্লভ।"—
ভ্রমি অধোমুখে ধীরে কহিলা ফাল্গুনি।
"শুনিয়াছিলাম যেন কহিছে যুযুৎসু—
অধার্মিক রথিগণ! এ অধর্ম-ফল
অর্জুনের অস্ত্রমুখে লভিবি অচিরে।"
নারায়ণ! তুমি কি তা করোনি শ্রবণ?
হায়! হায়! সুধৌতাগ্র-সপ্তরথি-শরে
হইয়া পীড়িত বুঝি অসহায় শিশু
স্মরিল—'হা পিতঃ! কোথা, কোথায় মাতুল?'
না-না, সে যে পুত্র মম, ভাগিনা তোমার
সুভদ্রার গর্ভজাত, এ বীরত্বগাথা
যে লিখিল কাল-বক্ষে, হেন আর্তনাদ
সে কেন করিবে? কিন্তু—ধিক্ ধর্মরাজ!
ভ্রাতৃগণ! সমবেত পাণ্ডব-পাঞ্চাল!
এইরূপে ব্যাধগণ বধিল শিশুরে!
ছিলে কি নিদ্রিত সবে? বর্ম, চর্ম, অসি,
রমণী-ভূষণ-মতো করো কি ধারণ?"
নতশিরে যুধিষ্ঠির বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কহিলা কাতর শোকে,—"ধনঞ্জয়! তুমি
জিজ্ঞাসিলে কার বুকে বসাইবে অসি?
হানো মম বুকে, আমি পুত্রহন্তা তব।
প্রবেশিল অভিমন্যু আদেশে আমার
চক্রব্যূহে বজ্র-বেগে, সার্থক জীবন
দেখিলাম সে বীরত্ব মানব-অতীত।
দাঁড়াইল জয়দ্রথ, অবরোধি দ্বার
হিমাচলশৃঙ্গ-সম, টলাইতে তারে
না পারিল সমবেত পাণ্ডব-পাঞ্চাল।"
"হা পুত্র!"—নিশ্বাসি দীর্ঘ বিধূমিত গিরি
করিতে লাগিল পুনঃ অগ্নি বরিষণ—
"হায় পুত্র! মত্ত সিংহ-শাবকে এরূপে
লোহার পিঞ্জরে বন্দী করিয়া কৌশলে,

ভুলিয়া সৌহৃদ্য মম, ভুলি প্রাণ-দান,
জয়দ্রথ করিল কি অবরুদ্ধ দ্বার!
জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!"—কৌরব শিবির
চাহিয়া গর্জ্জিলা ক্রোধে উন্মত্ত অর্জ্জুন,
কুরুক্ষেত্র থর-থর উঠিল কাঁপিয়া।
নিক্ষেপি গাণ্ডীব-ধনু বামে ও দক্ষিণে,
কাঁপায়ে কোদণ্ড-শব্দে কুরুক্ষেত্র পুনঃ
কহিলেন,—"ধর্মরাজ! এ প্রতিজ্ঞা মম,-
না লয় আশ্রয় তব কালি জয়দ্রথ,
না লয় পুরুষোত্তম কৃষ্ণের আশ্রয়,
কালি জয়দ্রথে আমি করিয়া সংহার
বরষিব শান্তি-বারি এই শোকানলে
আমাদের। নারায়ণ!"—পড়ি পদতলে
গোবিন্দের—"নারায়ণ! এই পাদপদ্ম,
অর্জ্জুনের শান্তি-ধাম, করিয়া ধারণ,
চাহি পুত্র-পানে বীর-শয্যায় শায়িত,
করিলাম এ প্রতিজ্ঞা,—দেখিয়া জীবিত
জয়দ্রথ কালি রবি হয় অস্তমিত,
এইখানে হুতাশন করি প্রজ্বলিত,
পিতাপুত্র একচিতা করিবে প্রবেশ।
কে বুঝিবে তব লীলা! ঘোর অমঙ্গলে
এইরূপে সাধ তুমি মানব-মঙ্গল।
বুঝিলাম এই শোক শিক্ষা অর্জ্জুনের।
অধর্মের অভ্যুত্থান বুঝিলাম হায়!
এতদিনে, এতদূরে; বুঝিলাম আর,
ধনঞ্জয় শ্লথকরে, আবৃত অসিতে,
যুঝিয়া করিতেছিল বৃদ্ধি নরমেধ,
মায়াবশে ভ্রান্তমতি; সপ্ত রথী আজি
খুলিল অসির সেই স্নেহ-আবরণ,
শাণিত করিল ধার, করিল সঞ্চার
শ্লথকরে বিদ্যুতাগ্নি, খুলিল নয়ন,—
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বুঝিনু এখন।"
উঠি বেগে নিষ্কোষিত করি ভীমা অসি,
আস্ফালি,—"এখন এই অসি অর্জ্জুনের
অজস্র শোণিত-উৎস করিবে খনন
অধর্মী অরাতি-বক্ষে; গর্জ্জিবে গাণ্ডীব

প্রলয়ের মেঘমন্দ্রে; ছুটিবে আয়ুধ
কেন্দ্রভ্রষ্ট প্রলয়ের সূর্যগণ-মতো।
পারিল না পিতা, পুত্র করিল স্থাপিত
আজি ধর্মরাজ্য দিয়া আত্ম-বলিদান।
বাজাও বিজয়শঙ্খ মহারথিগণ!
কালি জয়দ্রথে বধি ষষ্ঠাহ অতীত
না হইতে অরিকুল কর নির্মূলিত,
আমরা করিব সেই সাম্রাজ্য ঘোষিত।"
মহাশব্দে পাঞ্চজন্য উঠিল বাজিয়া
দেবদত্ত শঙ্খ-সহ; বাজিল তখন
সহস্র-সহস্র শঙ্খ; ঝটিকাগর্জন
উঠিল ভরিয়া যেন সায়াহ্ন-গগন।

ষোড়শ সর্গ

শোকে শান্তি

হত-বৎস শার্দূলের ভীষণ গর্জন-মতো
শোকে-ক্রোধে নিনাদিত শঙ্খের ঝংকার
মূর্ছা বধূ উত্তরার ভাঙিল, উঠিয়া বালা
দাঁড়াইল উন্মাদিনী চিত্রিতা আকার।
কুন্তল আলুলায়িত করিয়াছে বিমণ্ডিত
সোনার প্রতিমাখানি; হাসি খল-খল
কহে বাহু প্রসারিয়া,—"সুলিমা! সুলিমা!
চক্রব্যূহ জিনি অভি আসিছে রে, চলো
আজি বীর-পত্নী-মতো রণজয়ী বীরে
চল্ যাই আবাহন করিব অভিরে।
উঠ্ পোড়ামুখি! উঠ্! তোর এই চিরকাল,-
দুঃখের সময়ে তুই কাঁদিস সতত,
সুখের সময় নিদ্রা যাস এইমতো।
উঠ্ অভাগিনী! উঠ্!"—কহে করে ঠেলি।
"নারায়ণ! নারায়ণ!"—পড়িয়া গলায়
গোবিন্দেরে কহে পার্থ—"এই দৃশ্য আর
না পারি সহিতে, বুক বিদরিয়া যায়।"

"এ কি? রক্ত! এ কি? অস্থি! কোথা আমি?"—
চারিদিক চাহি উন্মাদিনী-মতো ঘূর্ণিত নয়নে,—
"ও কে কাঁদিতেছে? বাবা! ও কে অধোমুখে ওই?
নারায়ণ! কেন দেব! বিষণ্ণ বদনে?"
ছুটি উন্মাদিনী গলা ধরি গোবিন্দের
কহিল কাঁদিয়া,—"দেব! কহ একবার,
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে, নাথ!
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
মামা যার নারায়ণ, জনক গাণ্ডীবধন্বা,
জননী সুভদ্রা দেবী, এই দশা তার?
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
সমরে যাইতে আজি শূলাগ্রে ছিঁড়িল হার,
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার,
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনও রয়েছে পড়ি,
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর?
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তবার?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভালো,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার?
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরাব?
দেখিলাম স্বপ্নে আমি, আনি চারু-পুষ্পরথ
নিলে তুমি ভাগিনারে, নাও উত্তরায়।"
—চরণে পড়িয়া কাঁদি কহে চাহি মুখপানে,—
"দয়াময়! করো দয়া দুঃখিনী কন্যায়।
নহে যুগ, নহে বর্ষ, কেবল ছয়টি মাস
লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার?
ভাঙিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?"
"হা হত হৃদয়!"—পার্থ না পারি করিতে রুদ্ধ
শোকবাষ্প, উচ্চৈঃস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া।
বলিকা সে মুখপানে চাহিয়া-চাহিয়া
আবার উঠিল হাসি, ভ্রান্তি কুজ্ঝটিকা আসি
আবার ছাইল ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার;
পার্থের গলায় পড়ি সুবর্ণের হার
কহে,—"বাবা! না-না তুমি কাঁদিও না, অস্থি তব

করিয়াছে অভিমান আমি তাহা জানি,
জান না কি অভিমন্যু বড় অভিমানী।
পিতামহ-শরশয্যা কালি সে আঁকিতেছিল,
আমি সেই ছবিখানি লইনু কাড়িয়া;
শরশয্যা-অভিনয় করি তাই নিরদয়,
জননীর কোলে দেখো রয়েছে শুইয়া.
ওই দেখো রাখিয়াছে হাসিটি চাপিয়া।
পোড়ামুখী সুলোচনা কত জানে ছল ও মা!
দেখো সত্য-সত্য যেন রয়েছে মরিয়া;
কেমন রেখেছে বিষ-জিহ্বাটি চাপিয়া!
কাঁদিও না বাবা তুমি, যাই আমি বীণা আনি,
এখনি দেখিবে, শুনি বীণার ঝংকার
দু-জনের অভিনয় হবে চুরমার।"
যায় ছুটি উন্মাদিনী, ধরিলেন ধনঞ্জয়.
মূর্ছিতা হইয়া বামা পড়িল গলায়।
পুত্রপাশে পুত্রবধূ রাখিয়া ধরায়,
অতৃপ্ত নয়নে পার্থ নিরখিয়া কিছুক্ষণ
কহিলেন,—"যদুনাথ! দেখো একবার,
হুত-হুতাশন-পার্শ্বে ছিন্ন পুষ্পহার।
উঠ মা আনন্দময়ি! কালি জয়দ্রথজয়ী
ধনঞ্জয় আনিবে মা! বসন-ভূষণ,
উঠ মা বিরাটবালা! আবার সাজাবে ডালা
পুতুলের ; আমরা মা পুতুল যে তোর;
তোর এ পুতুল খেলা হয় নাই ভোর।
উঠ বোন সুলোচনা! তোর এ পুতুলদুটি
কি খেলা খেলিছে আজ বুঝিতে না পারি,
ওই দেখো ধরাতলে রহিয়াছে পড়ি।
সত্য বুঝি অভিমন্যু করিয়াছে অভিমান,
করিয়াছে এই শরশয্যা-অভিনয়।
উঠ মা উত্তরা! তোর কথা মিথ্যা নয়।
একদিন দ্বারকায় যাদব-শিশুর সনে
খেলিতে-খেলিতে শিশু কহিল ডাকিয়া—
"দেখো বাবা, মামা তুমি, দেখো না চাহিয়া
কেমন সুন্দর খেলা, খেলেছি আমরা আজি।"
ছিনু অন্যমনে কেহ না দিনু উত্তর।
খেলিল না শিশু, করি অভিমান ঘোর

পড়িল ভূতলে বসি, দুইনেত্রে অশ্রু খসি
শোভিল নক্ষত্রদুটি, কেশব ছুটিয়া
অভিমানী পুতুলটি লইলা তুলিয়া।
আজি বুঝি সেই-মতে চক্রব্যূহ একরথে
ভেদিয়া, করিয়া এই ভীষণ প্রলয়,
—আমি যে অর্জুন যাহা আমার বিস্ময়।—
হাসি শিশু খল-খল, উল্লাসে কহিল বুঝি,—
"দেখো বাবা-মামা তুমি দেখোনা আসিয়া,
বার বার সপ্তরথী যায় পলাইয়া।
ছিনু সংশপ্তক রণে, না শুনিনু দুইজনে,
সেই অভিমানে বুঝি শরশয্যা করি
রহিয়াছে ধরাতলে এইরূপে পড়ি।
উঠ বাবা! উঠ, চল! মনে বড় কুতূহল
জনক মাতুল তোর সেই মহারণ
দেখিবে, করিবে আর সার্থক জীবন।
উঠ ভদ্রা, উঠ দেবী, বীরজননীর মতো
সাজাইয়া বীর পুত্রে বীর-আভরণে
চলো যাই, এই রণ দেখি তিনজনে।
পতি-রথরশ্মি ধরি দেখেছিলে একবার
যে বীরত্ব, রথরশ্মি ধরি আরবার
পুত্রের বীরত্ব দেখো কত কল্প শ্রেষ্ঠতর,
কোথায় সরসী, আর পয়োধি ফেনিল!
কোথায় ঝটিকা, আর মলয় অনিল!"
"না-না, ধনঞ্জয়!—কৃষ্ণ কহিলা করুণ কণ্ঠে-
"কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র, রঙ্গভূমি নয়।
বড় ভাগ্য আমাদের, বড় ভাগ্য মানবের,
এই মহাশরশয্যা নহে অভিনয়।
ওই শরশয্যা পার্থ! এই শরশয্যা আর
উভয় মহিমাময়। কিন্তু কতদূর
প্রৌঢ়ের বীরত্বে, আর শূরত্বে শিশুর।
ভীষ্মদেব মরুভূমি; অভিমন্যু উপবন
নব-কিশলয়ে-পুষ্পে সুন্দর-শ্যামল।
সে ভীষণ লবণাম্বু; এ পবিত্র সুধাসিন্ধু।
সে বন্ধুর বিন্ধ্যগিরি; এই হিমাচল।
শিরে দেবী মন্দাকিনী সুভদ্রারূপিণী ওই
বহে বক্ষে দুই ধারা, জাহ্নবী-যমুনা,

পত্নীপ্রেম-মাতৃপ্রেম, উত্তরা ও সুলোচনা,
বারাণসী-বক্ষে যেন অসি ও বরুণা?
সম্মিলিত এই স্রোতে, বীরত্বের ব্রহ্মপুত্র
মিশিয়া করেছে কিবা তীর্থের সৃজন—
এই শরশয্যা গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম।
সেই সিন্ধু নারায়ণ। মাতৃপ্রেম, ধাতৃপ্রেম,
পতিপ্রেম, পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম আর
এইরূপে শত প্রেম, উপজিয়া শত ক্ষেত্রে,
মিলি একস্রোতে,—নরপ্রেম দুর্নিবার,
পশিয়াছে শতমুখে প্রেম-পারাবার।
কুরুক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র; কিন্তু কত রূপান্তর
বীরব্রতে প্রৌঢ়ের সে সমর্পণ প্রাণ!
নরহিতে শিশুর এ আত্মবলিদান!
সুভদ্রে!"—ডাকিলা কৃষ্ণ উচ্ছ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে।
পশে নাই যেই কর্ণে শঙ্খের গর্জন
শত-শত, প্রবেশিল মৃদু সম্ভাষণ।
ধীরে ঊর্ধ্ব-দুনয়ন নামিল, রহিল চাহি
কেশবের মুখপানে, ভক্তি ছল-ছল।
"সুভদ্রে!" কহিলা কৃষ্ণ—"নাহি আমাদের শোক,
গাও প্রেমপূর্ণ-স্বরে মানব-মঙ্গল!
যশস্বী কুমার তব লভিয়াছে যেই গতি,
কোন্ জননীর পুত্র লভেছে কখন?
আমরা সকলে মিলি সাধিতেছি যেই ব্রত,
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।
সফল জীবন-ব্রত, অধর্ম হয়েছে হত,
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।
গাইছে মানবজাতি কি মঙ্গল-গীত!"
এতক্ষণে জননীর বহিল নয়নে দুই
নিরমল বারিধারা, নহে শোক-জল,
আনন্দাশ্রু ভকতির আলোকে উজ্জ্বল।
"দয়াময়! নাহি শোক"—বাজিল ত্রিতন্ত্রী যেন
ভকতির পরশনে করুণা হিল্লোলে,—
"দয়াময়! নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে;
ক্ষত্রিয়ের গুরু দ্রোণ, ভুজবলে তাঁর পণ
ষোলো বৎসরের শিশু লঙ্ঘিল যাহার,

সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
ক্ষত্রিয়ের শিরোমণি সপ্তরথী একরথে
ষোলো বৎসরের শিশু জিনিল যাহার,
সেই বীর-জননীর শোক কি আবার?
সম্মিলিত সপ্তরথী সম্মুখি ভীষণাহবে
এই শরশয্যা শেষে হইল যাহার,
তার জননীর শোক সম্ভবে কি আর?
ক্ষুদ্র লতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল,
তাপিত মানবপ্রাণ করে সুশীতল;
তব পদাশ্রিতা লতা পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানব-মঙ্গল,—
লতার তো এই সুখ; পূর্ণ সুভদ্রার বুক
মাতৃপ্রেমে, পাদপদ্মে লও উপহার
সেই প্রেম, সুভদ্রার শোক কি আবার?
সমগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক মর-পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান পুত্র অনন্ত-অমর!
বড় ভাগ্যবান পুত্র তাহার নিয়তি পূর্ণ!
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনও ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার।
অনন্ত-অমর পুত্রে আনন্দে লইয়া বুকে
এইরূপে শিখাইব নাম নিরমল;
কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এরূপে করিয়া রণ
শিখাইব সাধিবারে মানবমঙ্গল।"
নীরব-নিশ্চল কৃষ্ণ, বিস্ফারিত দুইনেত্রে
চাহি আকাশের পানে শান্তির আধার।
শোক-ঝড়-বিলোড়িত হৃদয়েতে অর্জুনের,
শান্তির অনিল ধীরে হইল সঞ্চার।
চাহি দূর শূন্যপানে অস্ফুট-অস্ফুট যেন
দেখিলা সে পুত্রমুখ অনন্ত-অমর,
ছুটিল হৃদয়ে নব-প্রীতির নির্ঝর।
মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণ ডাকিলেন—"সুলোচনে!"
শুনিল না সুলোচনা, শুনিবে না আর।
পরশি ললাট কৃষ্ণ দেখিলেন, রহিলেন
চাহিয়া নীরবে, মুখ গাম্ভীর্য আধার।

"না-না, দেব! নিদ্রা তার"—কহিলেন ভদ্রা দেবী-
"না-না, দেব! নিদ্রা তার ভাঙিবে না আর।
তাঁহারো নিয়তি পূর্ণ, কি দয়া তোমার।
তব পদ হিমাচলে উপজি আনন্দ কলে
যে অনন্ত নির্ঝরিণী বহিল ছুটিয়া,
তার এক ক্ষুদ্র ধারা—পুণ্যময়ী সুলোচনা—
ভদ্রার্জুন-প্রেমস্রোতে গেল মিলাইয়া,
অভিমন্যু পুত্রে আজি হৃদয়ে লইয়া
হাসে নাহি নিজ সুখে, কাঁদে নাহি নিজ দুখে,
চিরদিন প্রেমময়ী সলিলের মতো
আপন তরল প্রাণ পরে করিয়াছে দান,
সুলোচনা চিরদিন পর-প্রাণগত।
তাহার নিয়তি ক্ষুদ্র, কিন্তু দেব! কি গভীর,
কি নিষ্কাম, নিরমল, কিবা পুণ্যাধাব।
অতি ক্ষুদ্র কর্মপথে, মানব যাইতে পারে
অনন্ত সুখের পার, বৈকুণ্ঠে তোমার,
পুণ্যবতী সুলোচনা আদর্শ তাহার।
যাও দিদি, যাও তবে, হায়! অভিমন্যু-সহ
হইয়াছে পরিপূর্ণ নিয়তি তোমার।
আশীর্বাদ করো, যেন তুমি পুণ্যবতী-মতো
পর-পুত্র বুকে প্রাণ যায় সুভদ্রার,—
নারায়ণ! পূর্ণ করো নিয়তি তাহার!"
সঙ্গে শিষ্যা দ্বৈপায়ন আসিলেন ধীরে-ধীরে,
উভয়ের ঊর্ধ্বনেত্র, ঊর্ধ্ব বাহুদ্বয়,
সুপবিত্র হরিনাম, উভয়ে করিছে গান,
বিগলিত প্রেম-অশ্রু দু-নয়নে বয়।
স্থির গাত্র, ঊর্ধ্বনেত্র, চিত্রার্পিত কুরুক্ষেত্র
এ সংগীত ভক্তিভরে করিল শ্রবণ।
চাহি অর্জুনের পানে শান্ত-স্থির দু-নয়নে
কহিলেন দ্বৈপায়ন উচ্ছ্বসিত মন,—
"ধনঞ্জয়! শোক তব করো পরিহার।
বিশ্বক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিশ্ব-নিয়ন্তার।
এ বিশ্বের স্তরে-স্তরে রয়েছে লিখিত
অভ্রান্ত ভাষায়,—নাহি হইতে সৃজিত
ক্ষুদ্রতম জীব-বীজ, গিয়াছে বহিয়া
কি অনন্ত কাল বিশ্ব ভাঙিয়া-গড়িয়া।

ছিল কত-শত জীব, আজি নাহি আর;
কত-শত নব-জীব হইবে আবার
কে বলিবে? কিম্বা মহাকালের হুংকার
উঠিছে পশ্চাতে, আর সম্মুখে তোমার।
কালের তরঙ্গে যদি নেয় ভাসাইয়া
মানব-জীবন বীজ, দেয় মুছাইয়া
পৃথিবীর বক্ষ হতে মানবের নাম,
সর্ব জীবনের বীজ করে তিরোধান,
তথাপি এ মহাবিশ্ব যাইবে ছুটিয়া
অনন্তকালের গর্ভে ভাঙিয়া-গড়িয়া।
ভাঙিতেছে পুরাতন গড়িছে নূতন,
জগতের নীতি এই মহাবিবর্তন।
এই বিবর্তনগর্ভে আমি ক্ষুদ্র নর,
কেমনে রহিব স্থির, হইব অমর?
পুত্র যাবে, পৌত্র হবে, প্রপৌত্র আবার,
এই বিবর্তনে,—শোক কর পরিহার।
সৃজন, পালন, লয় করিছে সাধন
মুহূর্তে অনন্ত এই নীতি-বিবর্তন।
কি সে নীতি, কে নিয়ন্তা, কিছুই না জানি;
আছেন উভয়, জানি ক্ষুদ্র নর আমি।
চেয়ে দেখ বীণাযন্ত্র কত ভিন্ন তার।
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, স্বতন্ত্র সবার।
কিন্তু সর্ব তার হয় একস্বরে লয়,
সেই মূল স্বরে তার বাঁধা সমুদয়।
মহাযন্ত্র বিশ্বরাজ্য কর দরশন!
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, দেখ অগণন!
আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, স্বতন্ত্র সকল,
নিত্য-বিবর্তিত বিশ্ব তবু সুশৃঙ্খল
এক মহানীতি বলে; কি নীতি না জানি,
কে নিয়ন্তা নাহি জানি, এইমাত্র জানি
সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ
বিশ্বের সে মূল নীতি, ধর্ম-সনাতন।
আর জানি সে নিয়ন্তা এই বিশ্বস্বামী;
তিনি মাতা, তিনি পিতা, তিনি অন্তর্যামী।
তাঁহার নীতিতে বিশ্ব হতেছে চালিত
কল্প-কল্পান্তর, হয়ে ঘোর বিবর্তিত,

অনন্ত উন্নতিপথে। এই বিবর্তনে
ঝরে যথা শোক-অশ্রু মানব-নয়নে,
ফুটে তথা সুখে-হাসি মানব-বদনে।
কোন্ অশ্রু, কেন হাসি, কিছুই না জানি;
সকলি তাঁহার ইচ্ছা; এই আমি জানি
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।
আমি সে মানব-অংশ, পুত্রও আমার;
আমি মরি, মরে পুত্র, শোক কি আবার?
মরে পিতা, মরে পুত্র, না মরে মানব।
নাহি হয় উন্নতির তিলার্ধ লাঘব।
জলবিম্ব যায় পার্থ! মিশাইয়া জলে।
একে ভাটা, অন্যদিকে জোয়ার উছলে।
এই উন্নতিই সুখ; শোক, বিঘ্ন তাব।
এ শোকে মানব আজি করে হাহাকার।
নর-শোকে পুত্রশোক করি নিমজ্জিত,
আপন নিয়তি উচ্চ করিয়া পালিত,
তব বীর-পুত্র-মতো, হও অগ্রসর
মানব-উন্নতিপথে। ওই শিরোপর
নারায়ণ, উন্নতির পূর্ণ পরিণতি!
চারিদিকে উন্নতির বিবর্তন-গতি
বিলোড়িত করি বিশ্ব যাইছে ছুটিয়া
কি প্রখর বেগে বিশ্ব ভাঙিয়া-গড়িয়া।
চল ভাসি মানবের সাধিয়া মঙ্গল,
আনন্দে গাইয়া "হরে! মুরারে" কেবল।
শিষ্যা উদাসিনী-স্থির দাঁড়াইয়া এতক্ষণ,
ঊর্ধ্বনেত্রে আত্মহারা হৃদয় অচল।
জানু পাতি বসি ধীরে, মৃত কুমারের শিরে
বর্ষিল চুম্বন, দুইবিন্দু অশ্রুজল।
নীরবে উঠিয়া গিয়া পড়ি পার্থ-পদতলে,
    কহিল—"চাহিয়া দেখ শৈলজা তোমার
    তব পদতলে, পূর্ণ তপস্যা তাহার।"
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ উচ্ছ্বাসে উন্মত্তপ্রায়
    লইয়া তুলিয়া বুকে নীলাব্জ-প্রতিমা,
    শোভিল সুনীলাকাশে সন্ধ্যার নীলিমা।
"শৈলজে! শৈলজে! শৈল!"—সরিল না কথা আর

শোকপূর্ণ হৃদয়ে যে ছুটিল উচ্ছ্বাস,
নাহি তার ভাষা, পার্থ স্থির-চিত্রাঙ্কিতপ্রায়
রহিলেন আত্মহারা চাহিয়া আকাশ।
শৈলজা পড়িয়া পুনঃ অর্জ্জুনের পদতলে,
চাহি শান্ত দুনয়নে, কহে পুনর্বার—
"অজ্ঞানী মানব নাথ! কল্পনা করিয়া যথা
নারায়ণরূপ, পূজা করি দেবতার,
হয় পূর্ণ মনোরথ, দেখে জীবনের পথ,
দেখে শান্তি-সুধাপূর্ণ জীবন-নির্ঝর,
অন্ত-অন্তরালে দেখে অনন্ত ঈশ্বর;
তেমতি পূজি তোমায়, শৈলজার দেবতায়,
ক্ষুদ্র নিয়তির রেখা করেছি দর্শন,
পূজি নর, পাইয়াছি নরনারায়ণ।
পতিত-পাবনী মাতা সুভদ্রার পদতলে
শুনিলাম কর্ণে যেই নাম পুণ্যময়,
আজি পুত্র পুণ্যবান দিয়া আত্মবলিদান,
লিখিল হৃদয়ে নাম অমৃত-নিলয়।
চতুর্দশ বৎসরের তপস্যার পরে নাথ!
ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার,
পুত্র আজি প্রাণ দিয়া মুছাইল সেই ছায়া,
পতি, পিতা, পুত্র, তুমি আজি শৈলজার;
পুণ্যবতী,—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।
আমি তার বনমাতা, বনে তার কত ভ্রাতা
করিবে বিরহে তার বনে হাহাকার,
বনের আলোক আজি হইল আঁধার।
পুত্রপ্রেম-প্রস্রবণ, উদ্ধার করিতে বন,
শূন্য করি তব অঙ্ক, মাতা সুভদ্রার,
গেল উড়ি প্রেম-পাখি; শূন্য অঙ্কে—মুছ আঁখি,-
বনপুত্রগণে তবে দেও অধিকার,—
প্রেমময়! পুত্রশোক রবে না তোমার।
উঠ মা! উঠ মা!"—শৈল ধরি সুভদ্রার কর
কহিল—"উঠ মা! না-না, আমরা কখন
করিব না আজি শোক-অশ্রু বরিষণ।
জগতে কাঁদিয়া আসি, এইরূপে গেল হাসি
কাঁদায়ে জগৎ যেই শিশু দেবোপম
আমরা তাহার তরে কাঁদিব না, তার তরে

করিবে অনন্ত কাল অশ্রু বরিষণ।
বর্ষিব না অশ্রুবিন্দু আমরা কখন।
উঠ মা! উঠ মা! ওই সর্বশোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিববুকে পুত্র সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাই কৃষ্ণনাম, মা গো! জুড়াই জীবন।
স্নেহের শৃঙ্খল তোর, স্নেহের শৃঙ্খল মোর,
কাটিলেন বিধি যদি, উধাও উড়িয়া
তুই গৃহে, আমি বনে বন-বিহঙ্গিনী-মতো,
গাব কৃষ্ণনাম মাগো! বিশ্ব জুড়াইয়া।"
উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া অর্জুন লইয়া তুলি
এক করে পুত্র, পুত্রবধূ অন্য করে
অর্পিলেন গোবিন্দের বক্ষে প্রেমভরে।
পুণ্যবতী সুলোচনা পড়িয়া চরণতলে,—
সেই পাদপদ্ম বিনা স্বপনেও আর
জানে নাহি অনাথিনী জীবনে তাহার।
বসি পাদপদ্মতলে, শৈলজা, সুভদ্রা, পার্থ,
প্রীতির শান্তির তিন মুরতি সুন্দর।
এতক্ষণ সুভদ্রার বহিল যুগল নেত্রে
পতিত-পাবনী প্রীতিধারা দর-দর।
এক করে মৃত পুত্র, অন্য করে পুত্রবধূ
মূর্ছিতা বিমুক্তকেশী লইয়া হৃদয়ে
দাঁড়াইয়া নারায়ণ; কি মূর্তি মহিমাময়!
ঊর্ধ্বনেত্রে নিরমল প্রীতিধারা বয়।
ঊর্ধ্ববাহু দ্বৈপায়ন, ঊর্ধ্ববাহু কুরুক্ষেত্র,
অশ্রুনেত্রে, প্রেমকণ্ঠে সায়াহ্ন-গগন
পূরিয়া গাইল "হরে! মুরারে!" তখন।

সপ্তম সর্গ

লীলা শেষ

হাসিছে প্রভাস; নিশি দ্বিতীয় প্রহর।
মধ্য নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র বসন্তের
করি সমুজ্জ্বল ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডল,—
চারু-চন্দ্রাতপ নীল-অমৃতে রঞ্জিত,—
নিম্নে মহাসিন্ধু নীলামৃতে তরঙ্গিত।
শিবির অনতিদূরে ধবল বেলায়—
যূথিকার পুষ্পাসন ধৌত চন্দ্রকরে,
বসি নরনারায়ণ, বেদি নীলোৎপলে,
মানব অদৃষ্টাকাশ করি সমুজ্জ্বল,
করি সমুজ্জ্বল মহাকাল-পারাবার।
নীলমণিময় দেহ-তীর্থের অন্তরে
যেন শত পূর্ণচন্দ্র হইয়া উদিত,
করিতেছে নীলামৃত কৌমুদী নিঃসৃত,
সুশীতল, সমুজ্জ্বল, পতিতপাবন,
আলোকিয়া চন্দ্রকরে আলোকিত বেলা।
উপলে রাখিয়া পৃষ্ঠ, রাখি ঊর্দ্ধ শির,
আকর্ণ-বিশ্রান্ত নেত্রে, করুণা-নির্ঝর,
চাহি অনন্তের পানে প্রশান্ত বদন।
অঙ্গে-অঙ্গে রাজবেশ, মস্তকে উষ্ণীষ,
জ্বলিতেছে চন্দ্রালোকে, পূর্ণচন্দ্র-করে
জ্বলিতেছে ততোধিক ললাট, বদন।
শৈলজা আসিয়া ধীরে প্রতিমা-প্রীতির,
প্রেমাশ্রুতে ছল-ছল নেত্র-ইন্দীবর;
নীলামৃতে ছল-ছল, গৈরিকে আবৃত,
শান্ত-সুললিত দেহ; বেণী অমসৃণ
বেষ্টিয়া মস্তক চারু, চূড়ায় সুন্দর
শোভিছে অসাবধানে ললাট-উপর;

শোভিছে গলায় ভক্ত-দত্ত পুষ্পমালা,
রত্নমালা কণ্ঠে যেন দেবী-প্রতিমার;—
আসি চন্দ্রালোকে ধীরে প্রণমিল শৈল
নারায়ণ-পদাম্বুজে। অর্পিয়া চরণে
কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার, রাখিয়া হৃদয়ে
দেবপদ-কোকনদ, ভক্তির ত্রিদিবে,
বসিল শৈলজা, যেন সন্ধ্যা নিরমলা
বসিল সুনীল-শান্ত নীলাম্বর-পদে।
"প্রাণনাথ! হৃদয়ের এ পূর্ণ উচ্ছ্বাস,—"
কাতরে কহিল শৈল—"এই শৈলজার
প্রেম-বরিষার পূর্ণ প্রবাহ উদ্বেল,
লও শান্তি-সিন্ধু পদে, পূরাও বাসনা!
মধ্য-উৎসবেতে বজ্রনিনাদের মতো
শুনিল স্তম্ভিত যাত্রী—'সমাপ্ত উৎসব।
কৃষ্ণের আদেশ।—যাত্রী যাবে রজনীতে
পঞ্চক্রোশ, আজ্ঞা নাহি করিবে লঙ্ঘন!'
থামিল উৎসব-সিন্ধু-কল্লোল নিমিষে।
লীলা-গীত অর্ধ তানে, বাদ্য অর্ধ তালে,
থামিল, মৃদঙ্গে কর রহিল লাগিয়া।
নৃত্যশীল উর্ধ্ববাহু ভক্তবৃন্দ তব
বজ্রাহত দাঁড়াইল প্রতিমূর্তি-মতো।
মুহূর্ত উৎসবক্ষেত্র নিষ্কম্প-নীরব,
দেখিলাম চন্দ্রালোকে মহাচিত্র-মতো!
ব্যাপিয়া প্রভাসতীর উঠিল ভাসিয়া,
সেই নীরবতা-বক্ষে, সমুদ্রগর্জন
মুহূর্ত; মুহূর্ত পরে যাত্রী-হাহাকার
উঠিল ভাসিয়া প্লাবি জলধি-কল্লোল।
সৈকত-ধুলায় পড়ি গড়াগড়ি দিয়া
কহিল কাঁদিয়া—'হরি! দুটিদিন আর
ছিল সাধ নিরখিয়া পতিতপাবন
জুড়াইব প্রাণ, কেন হইলে নিদয়?'
কহিল কাঁদিয়া—'মা গো! তোরা দুইজন
এ পাপী সন্তানগণে দিয়া পদাশ্রয়
লয়ে চলো বৃন্দাবনে, দেখা গোপালের
সে কিশোর-লীলাভূমি পতিতপাবনী।
অবগাহি যমুনার সুশীতল নীরে,

আলিঙ্গিয়া সুশীতল কদম্ব-তমাল,
কৃষ্ণ-পদে পবিত্রিত শ্যাম-দূর্বাদলে
—ব্রজাঙ্গনা প্রেমাশ্রুতে সিক্ত-সুশীতল—
রাখি এ তাপিত বক্ষ, এ প্রেমপিপাসা
জুড়াইব, প্রাণ মা গো! বড়োই আকুল।'
চলিল না পদ মম, সুভদ্রা আপনি
চলিলেন, ভক্তগণ বেষ্টিয়া তাঁহায়
সরল শিশুর মতো নাচিয়া-নাচিয়া,
গাহিয়া-গাহিয়া নাম-গীত সুমধুর,
দুইনেত্রে প্রেমধারা, গিয়াছে চলিয়া।
বড়ই আকুল প্রাণ তব শৈলজার!
আসিল ছুটিয়া রাখি চরণযুগল
জুড়াইতে এ হৃদয়ে, আকুলতা তার।
উৎসবান্তে উৎসবের আলয়ের মতো
করিতেছি হাহাকার এই পুণ্যভূমি,
এই নব-কুরুক্ষেত্র, নব-বৃন্দাবন।
প্রাণনাথ! দীনবন্ধো! তুমি দয়াময়!
করুণার সিন্ধু তুমি! কেন এইরূপে
ভাঙিলে উৎসব নাথ! দিলে ব্যথা প্রাণে
ভক্তদের এইরূপে অকরুণ মনে?"
রাখিয়া দক্ষিণ কর শৈলজার শিরে,
নারায়ণ স্নেহকণ্ঠে কহিলা—"বুঝিবে।"
সেই সুপ্রসন্ন মুখ প্রদীপ্ত শীতল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, চাহিয়া-চাহিয়া
কহিতে লাগিল শৈল—"পতিতপাবন!
সমস্ত পতিত জাতি করিলে উদ্ধার,
ভাসাইলে এ ভারত প্রেমের প্রবাহে!
আর্য ও অনার্য, নাথ! দুই মহাস্রোত
এ প্রেমপ্রবাহে আজি হইয়া পতিত,
সলিলে সলিল যেন হইয়া বিলীন,
ছুটিল কি সিন্ধু-মুখে শান্তি-পারাবার!
আজি এ ভারত-নাথ! বৈকুণ্ঠ তোমার,
তুমি নরনারায়ণ, পূর্ণ সনাতন!
আজি ভদ্রা শৈলজার পূর্ণ মনোরথ!
এ পতিতা শৈলজার স্বজাতি কেবল
রহিল পতিত নাথ! তাহাদের প্রতি

হইলে নিদয় কেন? কেন নিবারিলে
এ দাসীরে নাগপুরে করিতে গমন,
শুনাইতে কৃষ্ণনাম সে পতিত বনে?
শৈলজার জন্মস্থান, জাতি শৈলজার,
রহিল পতিত নাথ! রহিল পতিত
শৈলজার পিতা-পুত্র-ভ্রাতা নাগপতি;
জরৎকারু, মাতা-কন্যা-ভগ্নী শৈলজার।
বনের সুস্বাদু ফল, বন-নারিকেল,
বনবাসী ভ্রাতা মম; দৃঢ় আবরণ,—
হৃদয় মধুর শস্যে মধুর সলিল।
ভগ্নী নিদাঘের নদী অন্তরসলিলা;
রমণীর অভিমান তপ্ত আবরণে
বহিতেছে প্রেমধারা নির্মলা-শীতলা।
আশার ও নিরাশার কি উগ্র অনল
জ্বলিয়াছে তাহাদের কোমল হৃদয়ে
মহাবাড়বাগ্নি-সম!—দয়াময় তুমি,
কেন তাহাদের প্রতি হইলে নিদয়?"
আবার প্রসন্ন মুখে উত্তরিলা হরি
সস্নেহে—"বুঝিবে শৈল!"
চারু-নেত্রে চারি
চাহি পরস্পরে স্থির পূর্ণচন্দ্রালোকে,—
প্রভাত-শিশির-সিক্ত চারি ইন্দীবর
চাহি পরস্পরে, শান্ত, স্থির, অবিচল।
দেখিয়া শৈলজা যেন কি প্রেম-উচ্ছ্বাস
উঠিল ভাসিয়া দেবনেত্রে ছল-ছল।
কহিলা কোমলতর কণ্ঠে নারায়ণ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!"—শৈলজা প্রথম
শুনিল যুগল নাম কণ্ঠে কেশবের
এতদিনে, এতদূরে! কি কণ্ঠ মধুর!
কিবা প্রেম-বিগলিত! কহিল প্রেমিক
চির-প্রেমিকের; যেন চির-প্রেমিকার,
চির-মধুময় নাম চির-প্রেমময়।
আশৈশব এই নাম শুনিয়াছে শৈল
প্রেমময়ী, শুনে নাই এমন মধুর!
মুহূর্ত নীরব রহি কহিলেন পুনঃ—
"বাসুকি ও জরৎকারু!—ইহাদের সম
ভক্ত মম নাহি শৈল! এই ধরাতলে।"

ভগবান! তব মুখে বড়ই মধুর
ভক্তনাম!—ভক্ত তব, ভক্তের যে তুমি!
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!"—
কাঁদিয়া পড়িল শৈল লুটায়ে চরণ।
"প্রাণনাথ! লীলাময়! এ কি লীলা তব!
বাসুকি ও জরৎকারু ভক্ত তব যদি
কেন তাহাদের এই অশান্তি-অনলে
পোড়াইলে হায় নাথ! একটি জীবন?
চলো নাথ! চলো যাই পতিত পাতালে!
নাগপুর হবে তব নব-ব্রজপুর;
বাসুকি শ্রীদাম সখা; শৈল জরৎকারু,
—হায়! নাথ! জরৎকারু মহামরুভূমি,
চিরপ্রেম-পিপাসিনী, চির-উন্মাদিনী!—
হইবে ব্রজের গোপী; বহিবে যমুনা
সিন্ধুনদে সিন্ধুমুখে, গাহিয়া-গাহিয়া
পতিতপাবন নাম; সাগর-সঙ্গমে
হইবে ব্রজের প্রেম অনন্ত-অসীম!
হইল উদ্ধার নাথ! অহল্যার মতো
পতিতা অনার্য-ভূমি; হইল উর্বর
উষর অনার্য-ভূমি; হইল শোভিত
মরুভূমি প্রেমপুষ্পে, প্রেম-সরোবরে,
তব কৃপা-জাহ্নবীর প্রবাহে শীতল;
কেবল কি নাগভূমি রবে মরুময়?
কেবল কি নাগপতি, কারু কি কেবল,
হৃদয়ে বহিবে মরু? নিবিবে না হায়!
কেবল কি তাহাদের প্রাণের পিপাসা?"
"নিবিবে—নিবিবে—শৈল!"—ধীরে নারায়ণ
কহিলেন স্থিরকণ্ঠে গাম্ভীর্য-পূরিত—
"পূর্ণ কাল;—পূর্ণ ব্রত;—পূর্ণ মনোরথ।"
সে মুহূর্তে অকস্মাৎ যাদবশিবিরে
উৎসব-নিনাদ-বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
ঘোর হাহাকার-ধ্বনি; উঠিল কাঁপিয়া
শৈলজার বক্ষ;—শান্ত-স্থির নারায়ণ!
সে ভীষণ হাহাকার হইতেছে ক্রমে
অধিক অধিকতর, ধীরে দূরাগত
মহাঝটিকার মতো। হইল অধীর

শৈলজার প্রাণ;—শান্ত স্থির নারায়ণ!
"যদুনাথ!—জগন্নাথ!—বিপদ্‌ভঞ্জন!
কর রক্ষা যদুকুল।"—উর্দ্ধশ্বাসে আসি
দারুক চরণতলে হইয়া পতিত
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"উন্মত্ত সুরায়
সাত্যকি ও কৃতবর্মা নিন্দি পরস্পরে,
সাত্যকির খড়্গাঘাতে হইয়াছে হত
কৃতবর্মা। জ্বলিয়াছে হায়! ঘোরতর
অন্তর-বিগ্রহানল। উন্মত্ত সুরায়
যদুকুল সে অনলে মরিছে পুড়িয়া
আঘাতিয়া পরস্পরে,—রক্ষ যদুকুল!"

অকস্মাৎ ভূমণ্ডল উঠিল কাঁপিয়া;
দুলিল ফণায় স্থিত ক্ষুদ্র মণিমত
ভুজঙ্গের। মুহূর্ত্তেক উঠিল ভাসিয়া
বিহঙ্গের কলরব, ভীত, নিদ্রোত্থিত;
দূরস্থিত যাদবের মহা-হাহাকার
হইল ভীষণতর; মুহূর্ত্তেক পরে
হল নিমজ্জিত মহাজলধি-গর্জনে।
করিয়া ভীষণতর সে ভীম নির্ঘোষ
উঠিল ঘর্ঘরধ্বনি গর্ভে বসুধার!
সংখ্যাতীত রথে যেন মত্ত দৈত্যগণ
মহাহবে;—হইতেছে ভীমবেগে যেন
রথে-রথে অস্ত্রে-অস্ত্রে ভীম সংঘর্ষণ!
বিদীর্ণ করিয়া ধরা, রৈবতক গিরি,
দুর্বাসা-আশ্রম-শৃঙ্গ, শত বজ্রনাদে
হইল বিক্ষিপ্ত কিবা ভীম বহ্নিরাশি!
কিবা দর্পে, কিবা বেগে ছাইল গগন!
নভঃস্থল, ভূমণ্ডল, উঠিল জ্বলিয়া
নীল রক্ত বৈশ্বানরে;—কি ক্রীড়া ভীষণ,
আস্ফালন অনলের, ঘোর বিলোড়ন!
ঘন-ঘন ভূকম্পন, ঘর্ঘর গর্জন!
নিবিল সে বহ্নিরাশি। ধূম্র বিভীষণ
নিবিড় মেঘ-তরঙ্গে ছাইল গগন,
আবরিল পূর্ণশশী, করি নিমজ্জিত
অমাবস্যা-অন্ধকারে বিশ্ব-চরাচর।

ভস্মবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি, বৃষ্টি সাগরের
হইতেছে মুহুর্মুহু মৎস নানাবিধ,—
যেন মহাতিমিঙ্গিল গিরি রৈবতক
প্রসারি ভীষণ মুখ করিতেছে বেগে
উৎক্ষেপিত বহ্নিরাশি। গিরি-অঙ্গ বাহি
পড়িছে গৈরিক ধারা অগ্নিধারা-মতো
মহাস্রোতে স্থানে-স্থানে; পড়িতেছে বেগে
প্রজ্বলিত ধাতুপিণ্ড, উল্কারাশি-মতো,
অস্ত্র-ভেদ্য অন্ধকারে, ভস্ম-বরিষণে।
যাদব শিবির-শ্রেণী মহা-অন্ধকারে
উঠিল জ্বলিয়া মহাদাবানল-মতো
অকস্মাৎ;—ছুটিলেন বেগে নারায়ণ,
দারুক শৈলজা-সহ, ঘোর ভূকম্পনে
সাবধানে দৃঢ় পদে, লইয়া উভয়ে,
অর্ধমূর্ছাগত, ভুজ-বন্ধনে হেলায়
অতিক্রমি সে ভীষণ বৃষ্টি, অন্ধকার।
দেখিলেন নারায়ণ, দাবানল-মাঝে
পতঙ্গপালের মতো মরিছে পুড়িয়া
যদুকুল, আঘাতিয়া হায়! পরস্পরে,
দূরাগত গুপ্ত অস্ত্রে হইয়া আহত।
দেখিলেন যদুকুল উন্মত্ত সুরায়,
নাহি জ্ঞান আত্মদ্রোহ, ভৌতিক বিপ্লব,
গুপ্ত শত্রু-আক্রমণ। কি দৃশ্য ভীষণ!—
জ্বলিছে শিবিরশ্রেণী ব্যাপিয়া যোজন!
যাদবের অস্ত্র-ক্রীড়া, অসি-বিঘূর্ণন,
রজত বিদ্যুৎনিভ—ঝলসি নয়ন!
সেই ঘাত, প্রতিঘাত! সেই রক্তপাত!
ভস্মবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি আগ্নেয়াস্ত্র-মতো!
ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের মতো অস্ত্র-বরিষণ
গুপ্ত-শত্রু-করোৎসৃষ্ট! ঘোর অন্ধকার!
ঘন-ঘন ভূকম্পন! ঘোর গরজন,
উন্মন্থন, জলধির ভীষণ নির্ঘোষ
বসুধার মহাগর্ভে! শৃঙ্গে পর্বতের
ভীমারাবে ভস্ম, ধাতু, অগ্নি-বরিষণ!
যাদবের হাহাকার ভৌতিক নির্ঘোষে
নিমজ্জিত; যাদবের ভীষণ সে রণ

কাষ্ঠ-পুতুলের ক্রীড়া-অভিনয়-মতো
হইতেছে প্রকটিত অগ্নির আলোকে।
আছিল উৎসবে, নাহি অস্ত্র সকলের,
তীরজাত এরকায়, মূষলে-মূষলে,
প্রহারিছে পরস্পরে, হইতেছে হত
নাহি জ্ঞান গুপ্ত শরে, নহে এরকায়।
স্থিরনেত্রে নারায়ণ রহিলা চাহিয়া
সে ভীষণ মহাদৃশ্য! ক্রমে-ক্রমে হত
হইল যাদবকুল, স্নেহের আধার
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, বন্ধু। রথী-মহারথী
ভারতের অদ্বিতীয় হইল নিহত
তস্করের গুপ্ত অস্ত্রে, অস্ত্রে আপনার,—
রৈবতক শৃঙ্গমালা পড়িল ভাঙিয়া
একে-একে যথা এই মহাভূকম্পনে।
নিবে যথা প্রলয়াগ্নি ভীম পরাক্রমে
নিঃশেষিয়া আত্মতেজ, নিবিল তেমতি
আত্মঘাতী যদুকুল। ধীরে-ধীরে মহা-
শ্মশান-অনল-মতো শিবির-অনল
নিবিল; নিবিল সেই বিপ্লব ভীষণ।
নিবিল সে গিরিশৃঙ্গ, গৈরিক প্রবাহ,
ভস্মবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি, মহাভূকম্পন,
মহাকম্প জলধির। মাতা বসুন্ধরা
নাচিয়া তাণ্ডব-নৃত্যে, হাসিয়া ভীষণ
অনল গৈরিক স্রাবে মহা অট্টহাসি,
গর্জিয়া ভীষণ মন্দ্রে, নৃমুণ্ডমালিনী
মহাকালী, যদুকুল-শোণিতে ভূষিতা,
হইলেন শান্ত ধীরে। ধীরে ভয়ংকরী
প্রভাসের মহানিশি হইল প্রভাত
বীভৎস স্বপন-অন্তে প্রকৃতি যেমতি
খুলিলেন ভীত আঁখি, প্রথম আলোকে
প্রভাসের চারিদিকে উঠিল ভাসিয়া
চিন্তাতীত প্রকৃতির চিত্র-ভয়ংকর!
চারিদিকে ভস্মস্তরে রয়েছে পড়িয়া
কত জলজীব-শব, ধাতুপিণ্ড কত,
মহাশৈল-খণ্ড-সহ নানা অবয়বে।
ভীমাকৃতি শৈলশৃঙ্গ অমিত বিক্রমে

উৎপাটিত, উৎক্ষেপিত, হইয়া তাড়িত
শুষ্ক পত্ররাশি-মতো ক্রোশ-ক্রোশান্তরে,
স্থানে-স্থানে জলে-স্থলে রয়েছে প্রোথিত
ক্ষুদ্র খণ্ড-গিরি-মতো গর্ভে বসুধার।
সুদূরস্থ রৈবতক পর্বতমালায়
কি অচিন্ত্য মহাশক্তি কি অচিন্ত্য ক্রীড়া
করিয়াছে অঙ্গে-অঙ্গে! মৃৎপিণ্ডে যথা
অর্থহীন-লক্ষ্যহীন ক্রীড়া বালকের।
কোথায় গগস্পর্শী শৃঙ্গ মেঘ-প্রভা
হইয়াছে অন্তর্হিত মহামেঘ-মতো;
কোথায় বা নব-শৃঙ্গ উঠিয়া আকাশে
শোভিছে দিগন্তব্যাপী মহামেঘ-মতো
প্রসারিয়া শৈল-বপু; গৈরিকের ধারা,
কোথা জলধারা, কোথা প্রপাতের মতো,
শোভিতেছে অঙ্গে-অঙ্গে; কোথায় গহ্বর
হইয়াছে গিরি; গিরি হয়েছে গহ্বর।
সম্মুখে যে দৃশ্য—হায়! মানব-নয়ন
না পারে দেখিতে; দৃশ্য না পারে সহিতে
মানব-হৃদয় হায়! ছিল যেইখানে
ক্রোশব্যাপী যাদবের উৎসব-শিবির,
রহিয়াছে ক্রোশব্যাপী যাদব-শশ্মান!
বর্ষিত ভস্মের স্তরে, ভস্মে শিবিরের
প্রধূমিত স্থানে-স্থানে,—রয়েছে পড়িয়া
বিকৃত যাদব-শব, দগ্ধ, অস্ত্রাহত।
কেশবের পুত্র, পৌত্র, রক্ত, মাংস, প্রাণ,
ধাতু শৈলখণ্ড-সহ, কোথায় বা পড়ি
ধাতু শৈলখণ্ডতলে, অনন্ত শয়নে।
প্রভাস উৎসবক্ষেত্র শবক্ষেত্র এবে
যাদবের, প্রভাসের মহাপারাবার
এবে হায়! যাদবের শোক-পারাবার!
"এই কি করিলে হরি!"—কাঁদিয়া দারুক
কহিল চরণে পড়ি। শান্ত-কণ্ঠে হরি
উত্তরিলা, শান্ত নেত্রে চাহি অবিচল
প্রভাত-আকাশ, স্থির—"দারুক! দারুক!—
যাদবের কুরুক্ষেত্র! হয়েছে সাধিত
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ;
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হয়েছে স্থাপিত।

যুগ শেষ!—লীলা শেষ"—
উঠিল কাঁপিয়া,
ধরাতল। "লীলা শেষ"—উঠিল গর্জ্জিয়া
মহাসিন্ধু। "লীলা শেষ"—হইল অঙ্কিত
সুনীল আকাশপটে অরুণ-আভায়
সুশীতল-সমুজ্জ্বল। লভিয়া উদ্ধার
"লীলা শেষ" মহাকণ্ঠে গাহিল মানব।
"লীলা শেষ"—দুষ্কৃতের ভীষণ শ্মশান
মহাকণ্ঠে কুরুক্ষেত্র, গাহিল প্রভাস।
"লীলা শেষ"—পাদপদ্মে হইয়া মূৰ্চ্ছিত
পড়িল দারুক শোকে। "লীলা শেষ"—শৈল
পড়িতে মূৰ্চ্ছিতা পদে লইলেন হরি
আপন ত্রিদিব-বক্ষে,—পূর্ণ শৈলজার
তপস্যা, জীবনব্রত কোমল-কঠোর।

একাদশ সর্গ

স্বর্গারোহণ

এখন ঘোরাল দিবা, নাহি যেন দিবাকর।
কি যেন শোকের ছায়া ছাইয়াছে চরাচর।
কি যেন শোকের গীত গাইতেছে পারাবার।
কি যেন সমুদ্রানিল বহিতেছে হাহাকার।
শিলা-ভস্ম-সমাচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ শ্মশানপ্রায়,
বিস্তীর্ণ প্রভাসক্ষেত্রে যতদূর দেখা যায়।
এখনও বিদীর্ণ সেই রৈবতক-শৃঙ্গচয়
করিছে উদ্‌গীর্ণ ধূম্র সভস্ম গৈরিকময়
রহিয়া-রহিয়া, যেন করি মুখ ব্যাদানিত
করিতেছে দৈত্যব্যূহ ক্রোধ-বাষ্প উদ্‌গীরিত।
এখনও উঠিছে কাঁপি রহিয়া-রহিয়া ধরা,
হৃদয় রয়েছে যেন কি শোক-আবেগে ভরা!
কি যেন শোকের দৃশ্য বিস্তীর্ণ প্রভাসতীর,
ভস্মাচ্ছন্ন ঘোর কৃষ্ণ! ঘোর কৃষ্ণ সিন্ধুনীর!
ঘোর কৃষ্ণ আবরণে হইয়াছে একাকার!
অভিন্ন ধবল বেলা ঘোর কৃষ্ণ পারাবার।

নাহি চিহ্ন জীবনের, নাহি চিহ্ন জগতের!
যেন প্রলয়ের দিন
জগৎ হয়েছে লীন
মহাকাল-মহাবক্ষে, মহাবক্ষে প্রলয়ের।
অগ্নিগিরি উদ্‌গীরিত প্রস্তরে আহত, হত,
অনার্য পড়িয়া আছে স্থানে-স্থানে শত-শত।
নাহি হিংস্র জীব-চিহ্ন, শৃগাল, বায়সগণ;
কেবল উত্তপ্ত বায়ু স্বনিছে কি শোকস্বন
মাখি ধূম্র-ভস্ম অঙ্গে! আহতের আর্তনাদ
বহিয়া-বহিয়া ধীরে শোকে-ত্রাসে সবিষাদ!
কেবল সুভদ্রা-পার্থ, শোকে-ত্রাসে অভিভূত,
ভ্রমিছেন, করুণার অশ্রুতে নয়নাপ্লুত
করি আহতের সেবা, হৃতে বর্ষি অশ্রুজল,
করুণার নদ-নদী ভ্রমিছেন অবিরল।
আর চলিল না পদ; কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ;
সম্মুখে উৎসবক্ষেত্র প্রভাসের,—কি শ্মশান!
যথায় যোজনব্যাপী ছিল শিবিরের সারি,
আলোক-কুসুম-দামে নাট্যশালা অনুকারি,
দগ্ধ শিবিরের দণ্ড স্থানে-স্থানে চিহ্ন তার
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া, দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড আর।
ভস্মাবৃত-শবাবৃত, প্রস্তর-গৈরিকাবৃত,
বিস্তীর্ণ মহাশ্মশান ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত!
বিলাসের ভগ্ন, দগ্ধ, উপকরণের রাশি
আছে পড়ি শব-সহ; এখনও রয়েছে বাসি
বিলাস-কুসুম-দাম যাদবের-যাদবীর
অঙ্গে-অঙ্গে ভস্মাবৃত; করে পানপাত্র স্থির
এখন রয়েছে কারো; রয়েছে বিলাসবেশ
ভস্মাবৃত; ভস্মাবৃত বেণীবদ্ধ চারু-কেশ।
রহিয়াছে অঙ্গে-অঙ্গে রত্নময় আভরণ
যাদবের-যাদবীর, শুষ্ক অলক্ত-চন্দন।
পড়ি যন্ত্রী যন্ত্র করে, নর্তকী অর্ধেক নাচে;
বক্ষে মৃতা প্রণয়িনী প্রণয়ী পড়িয়া আছে।
কেহ গদাহত, কেহ অস্ত্রাহত নিদারুণ,
কেহ বা প্রস্তরে,—অস্ত্রে প্রকৃতির অকরুণ।
ভ্রাতায়-ভ্রাতায় যুঝি, কোথা ভ্রাতুষ্পুত্র-সহ
আছে পড়ি দুইজন; কোথা দৃশ্য শোকাবহ,—

দুই দ্বন্দ্বী মধ্যে আসি পত্নী, পুত্রী, ভগ্নী বলে
নিবারিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, পড়িয়াছে মধ্যস্থলে।
দুইদিকে দুই কর রহিয়াছে প্রসারিত;
কি করুণা, কাতরতা, রয়েছে মুখে অঙ্কিত!
নিমিষে নিরখি দৃশ্য—ঊর্দ্ধমুখে, অশ্রুজলে,
করজোড়ে ধনঞ্জয় বসিলেন ধরাতলে
জানু পাতি। ভদ্রা দেবী,—হৃদয়ে শান্তির ধাম,-
দাঁড়াইলা করজোড়ে, অধরেতে কৃষ্ণনাম
অস্ফুট; ঈষৎ ধীরে কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর,
ঊর্দ্ধমুখ শান্তিময়, স্থির নেত্র-ইন্দীবর।
রহিলেন দুইজন মূরছিত যোগস্থিত
মহাশোকে, স্থির দেহ, নয়ন অবিচলিত।
মহাশোকে অর্জ্জুনের করুণার পারাবার
উদ্বেলিত, অশ্রুধারা বহিতেছে অনিবার।
সুভদ্রার মহাশোক শান্তির সাগরে ধীরে
হইল বিলীন, নেত্র ছল-ছল প্রেম-নীরে।
কিছুক্ষণ পরে উঠি কহিলেন ধনঞ্জয়—
"এ কি লীলা হরি! তুমি প্রেমময়-দয়াময়।
দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্র, সেই শোক-পারাবার;
ক্ষুদ্র সরোবর, এর নহে যোগ্য তুলনার।
কুরুক্ষেত্র বীরক্ষেত্র, বীরের ত্রিদিব-ধাম।
প্রভাস উৎসক্ষেত্র,—তার এই পরিণাম!
কুরুক্ষেত্রে এইরূপে বিকট মৃত্যু-বিলাস,
করে নাই নির্ম্মম পরস্পরে উপহাস।
এরূপে অমৃতে তথা উঠে নাহি হলাহল।
এরূপে আমোদ-সুধা হয় নাই অশ্রুজল।
এইরূপে হাসি তথা হয় নাহি হাহাকার।
প্রমোদ নিকুঞ্জবন হয় নাহি পারাবার।
পড়েছিল বীরগণ মহা মহীরুহ যথা;
ছিল না এরূপে তাহে জড়িতা রমণী-লতা।
বসন্ত-বাহারে তথা উঠেনি দীপক রাগ।
ছিল না কুসুমবনে লুকাইয়া তীব্র নাগ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র আত্মহত্যার;
কুরুক্ষেত্রে বীর্যক্রীড়া; এ ক্ষেত্রে ক্রীড়া সুরার।
মানব, প্রকৃতি, মিলি করিয়াছে কি ভীষণ
দাবদগ্ধ, সুসজ্জিত সুরম্য প্রমোদবন!
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র, ধর্ম্মরাজ্য লক্ষ্য তার;
হরি! এইরূপে কুল করিলে কেন সংহার?"

কেবল কহিলা দেবী—"কর্মফল! কর্মফল!
এতদিনে ধর্মরাজ্য দৃঢ়, স্থির, অবিচল।"
কিন্তু কই, কৃষ্ণ কই? ছুটিলেন দুইজন
দেখিলেন সম্মুখেতে বৃক্ষতল মনোরম।
একটি গৈরিক খণ্ড, একটি খণ্ড শিলার,
পড়েনি একটি ভস্ম,—বেলাভূমি পরিষ্কার।
শোভিতেছে বেলাখণ্ড যেন বেলফুলরাশি,
শোকের শ্মশানে যেন শান্তির শীতল হাসি।
বুঝিলেন দুইজনে দারুক, শৈল, কেশব,
এইখানে দাঁড়াইয়া দেখিলেন এ বিপ্লব।
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে হইলেন দুইজন,
পাইলেন শোকে শান্তি পাতি বক্ষ অনুক্ষণ।
মহামরুদগ্ধ বুকে কি যেন তুষার-জল
প্রবেশিল, দগ্ধ প্রাণ করি শান্ত-সুশীতল।
ললাটে পরশি ভূমি প্রণমিয়া বহুবার,
মাখিয়া ললাট-বক্ষে পূজ্য পদরজ আর,
চলিলেন দুইজন ঊর্ধ্বশ্বাসে বহুদূর,—
ও কে! জননীর অঙ্কে যেন শিশু তৃষ্ণাতুর!
একটি রমণী অঙ্কে কখন রাখিয়া মুখ
করিতেছে ছটফট, ভূতলে রাখিয়া বুক।
কখন উঠিয়া চাহি শূন্যপানে আত্মহারা
ছুটিছে উন্মাদ-মতো, দু-নয়নে অশ্রুধারা।
"শৈলজে! শৈলজে!"—পার্থ কহি কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত
ছুটিলেন, লইলেন হৃদয়েতে উদ্‌বেলিত
শৈলজায়; কহিলেন নেত্রে অশ্রু ছল-ছল—
"কোথায় আছেন কৃষ্ণ? আছেন কুশলে বলো?"
দাঁড়াইয়া নাগরাজ ছিল চাহি শূন্যপানে,
সুমধুর কৃষ্ণনাম যেমতি পশিল কানে,
কহিলা আকুল কাঁদি,—"আহা কি মধুর নাম।
কে শুনাল, জুড়াইল পাপীর তাপিত প্রাণ?
গাও নাম আরবার। গাও নাম শতবার!
সহস্র-সহস্র বার! লও নাম, গাও আর।
গাও নাম পারাবার! গাও নাম সমীরণ!
গাও নাম চন্দ্র-সূর্য! গাও গ্রহ অগণন।
এমন মধুর নাম, পতিতপাবন নাম,
এমন ত্রিতাপহর, শীতল-শান্তির ধাম,

নাহি মর্ত্যে, নাহি স্বর্গে। এমন মধুর নাম,
গাও মুখ! গাও চোক! গাও অঙ্গ! গাও প্রাণ!
গাও মুখ মধুস্বরে! গাও চোক অবিরাম
বরষিয়া প্রেমধারা! নামামৃত করি পান,
গাও প্রেমানন্দে তুমি গলিয়া, পাষাণ প্রাণ!
নামামৃতে মত্ত অঙ্গ নেচে-নেচে গাও নাম!
হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!
কৃষ্ণ। হরে! হরে!
হরে! রাম! হরে! রাম! রাম
রাম! হরে! হরে!"
দুইবাহু ঊর্ধ্বে তুলি দিয়া তালি অবিরাম,
নাচিতেছে নাগরাজ গাহিয়া-গাহিয়া নাম
পাগল শিশুর মতো, বহিয়া নয়নধারা।
ভিজিতেছে বক্ষ, বেলা,—নাগরাজ আত্মহারা।
প্রেমানন্দে চিত্ত যেন হইয়াছে প্রপূরিত;
বহিতেছে অনিবার নেত্রপথে উদ্বেলিত।
সেই নৃত্যে, সে আনন্দে, সুভদ্রা ও ধনঞ্জয়
ভুলিলেন আত্মশোক, হইলেন তন্ময়।
সেই প্রেম! সে আনন্দ! সেই গীত! সে নর্তন!
হইতেছে বাসুকির স্বেদ-কম্প ঘন-ঘন।
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া দেহ অধীর
পড়িতে, আপন অঙ্কে ভদ্রা লইলেন শির।
মহাভাবে ভদ্রা, পার্থ, শৈল, আত্মজ্ঞানহীন
রহিলেন কিছুক্ষণ, আত্মপ্রেমানন্দে লীন।
মহাশোক-স্রোতস্বতী ধনঞ্জয়-সুভদ্রার
হইল বিলীন, পশি প্রেমানন্দ-পারাবার।
ধীরে-ধীরে বাসুকির উপজিলে বাহ্যজ্ঞান,
কহিলা শৈলজা—"দাদা! পূর্ণ তব মনস্কাম!
যে দেবী আরাধ্যা তব, জীবন-স্বপ্ন তোমার,
চেয়ে দেখো তব শির অঙ্কে সেই সুভদ্রার।
যেই পার্থ শত্রু তব, দেখো পদতলে বসি
সেবিছেন পদ তব! কি প্রেমে অশ্রু খসি
পড়িতেছে পদে তব, পড়িছে বক্ষে তোমার!
হইয়াছে প্রেমানন্দ কি মহাশোকে সঞ্চার!
জ্বলিলে একটি জন্ম যেই প্রেম-পিপাসায়
করো পান সেই প্রেম অজস্র সুধা-ধারায়!

পতিতপাবনী ধারা এই মাতা জাহ্নবীর,
জুড়াইবে প্রাণ তব, জুড়ায়েছে পাপিনীর।"
"সুভদ্রা! সুভদ্রা! পার্থ!"—নাগরাজ সবিস্ময়
উঠিয়া রহিলা চাহি মূর্তিবৎ, প্রীতিময়।
"সুভদ্রা!—জীবন-স্বপ্ন! সুভদ্রা! পিপাসা মম!
একটি চরণরেণু ভাবিতাম স্বর্গ-সম।
আমার আরাধ্য দেবী, আমার সর্বস্ব ধন,—
তাঁর অঙ্কে মম শির, আমি পাপী-নরাধম।
হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কিবা কামানলে
পুজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে!
করিয়াছি কুরুক্ষেত্র, এ প্রভাস সংঘটিত;
কৌরব-যাদব-রক্তে করিয়াছি কর্দমিত
এই কর, এই আত্মা;—সকলি লীলা তাঁহার!
আজি কোথা সে সুভদ্রা? সে বাসুকি কোথা আর?
স্বপন! স্বপন সব!—বিকট স্বপন-ঘোর!
সেই ঘোর অমাবস্যা আজি হইয়াছে ভোর।
আজি সেই পত্নীভাব মনে নাহি পড়ে আর;
আজি তুই প্রেমময়ী মা আমার! মা আমার!
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে, বুকে!
সে অঙ্কে শিশুর মতো বাসুকি ঘুমাবে সুখে!"
বাসুকি আবার অঙ্কে রাখি শিশু-মতো শির
কাঁদিতেছে, ভিজিতেছি অঙ্ক ঝরি অশ্রুনীর।
"তুই মম কারু আজি; তুই মম শৈল আর;
তুই মম মাতা, পিতা, তুই মা! কৃষ্ণ আমার!"
উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম হল পুনঃ ভাবাবেশ,
বাসুকি কহিল উঠি—"মরি! কি মধুর বেশ!"
চাহি সুভদ্রার পানে—"কি মোহন চূড়া শিরে!
কাঁপিতেছে শিখিপুচ্ছ মলয়ে কি ধীরে-ধীরে।
কেশে ফুলমালা, পৃষ্ঠে কি মোহন পীত-ধড়া!
কি ত্রিভঙ্গ নীল কান্তি, অতরল সুধা ভরা!
কি মোহন পীতাম্বর! গলে কিবা বনমালা!
চন্দন-চর্চিত বুক কি প্রেমের নাট্যশালা!
শ্রীঅঙ্গের কি সৌরভ যেন পারিজাতরাশি!
করপদ্মে বিম্বাধরে শোভে কি মোহন বাঁশি।
বাজিতেছে কি মধুরে!—ডাকিতেছে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই!"—ভাবাবেশে পুনরায়
পড়িলা ভদ্রার অঙ্কে প্রেমানন্দে মূরছিত।
হইলেন চারিজন ভাবে জ্ঞান-বিরহিত।

গাইলেন তিনজন,—প্রেমে পুলকিত প্রাণ,—
আত্মহারা চাহি শূন্য,—লীলাময় কৃষ্ণনাম।
বাসুকি মেলিলে নেত্র শুনিতে-শুনিতে নাম,
কহিলেন ধনঞ্জয়—"নাগেন্দ্র! আকুল প্রাণ,
কোথা কৃষ্ণ? কহ, তুমি পেয়েছে কি দেখা তাঁর?
কোথায় আছেন তিনি? পাইব কি হায়! আর
হৃদয়ে সে পদাম্বুজ? দেখিব নয়ন ভরি
নরনারায়ণ-রূপ, কহ দাসে দয়া করি!"
"কোথা কৃষ্ণ?"—নাগরাজ উঠি পুনঃ আত্মহারা
পার্থে আলিঙ্গিয়া কহে বিস্ফারি নয়নতারা—
"কোথা কৃষ্ণ?"—উচ্চহাসি বাসুকি উঠিল হাসি,
সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমসুধারাশি!
"কোথা কৃষ্ণ?—দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়?
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময়!
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্যে, কৃষ্ণ গ্রহে-উপগ্রহে।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত-চপলায়;
কৃষ্ণ ভীম-ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর-ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা-অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল-জ্যোৎস্নায়;
কৃষ্ণ সিন্ধু-জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধাবায়।
কৃষ্ণ মহাশৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে।
বিলাস-শয্যায় কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
প্রেমের কটাক্ষে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অস্ত্র-বরিষণে।
কৃষ্ণ শার্দূলের দন্তে, কৃষ্ণ নারীবিম্বাধরে।
শোকের ক্রন্দনে কৃষ্ণ, প্রেমের সংগীতস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ নয়নে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম এ অধরে।
কোথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয়?—কৃষ্ণ মম কণ্ঠস্বরে।
কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়।
কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায়!"
বক্ষের সে অস্ত্রক্ষত উত্তেজিত-বিস্ফারিত
হইয়া আবেগে, রক্ত হইতেছে প্রবাহিত।
রক্তজবা হতে যেন চন্দনের ধারা
ঝরিতেছে পুষ্পপাত্রে;—বাসুকির নেত্র-তারা
আবার উঠিল ভাসি প্রেমাশ্রুতে সুশীতল,
বিষ্ণুপদে উপজিল যেন জাহ্নবীর জল।

"কোথা কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়?" করি অসি নিষ্কোষিত,
কহিলা নাগেন্দ্র পুনঃ—"করো বক্ষ বিদারিত!
দেখিবে আমার সেই ননীচোরা নীলমণি;
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম-ক্ষীর-ননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি!
আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি!
শ্রীদাম-সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে!
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে!
কুঞ্জে-কুঞ্জে জ্যোৎস্নায় বাজে কি মধুর বাঁশি!
কি প্রেম-যমুনা বহে কি অনন্ত প্রেমরাশি!
ওই শুনো বাজে বাঁশি, ওই ডাকে—'আয়! আয়!'
এই যাই, এই যাই!"—প্রেমে রোমাঞ্চিত কায়
ছুটিলা বাসুকি বেগে নাচি করতালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় দুইবাহু প্রসারিয়া।
"যাক মান, যাক কুল! ছেড়ে দেও! ছেড়ে দেও!
জীবন-যৌবন নাথ! নাও তুমি, সব নাও!"
কাঁদিতে-কাঁদিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত
হইলা পার্থের বক্ষে,—দুই বক্ষ সম্মিলিত
কি শত্রুর, কি কঠোর! কিবা প্রেমানলে গলি
মিলিল-মিশিল, যেন রবিব কিরণে জ্বলি
মিলিল-মিশিল, যেন স্নিগ্ধ দুখানি কোমল ননী;
চন্দ্র করে যেন দুটি চন্দ্রকান্ত মণি-খনি।
দুইদিক হতে আসি দুই নদ বিপরীত,
মিলিল-মিশিল মহাপারাবারে পবিত্রিত।
অর্জুনের অংসোপরে মুগ্ধ শির বাসুকির।
বাসুকির অংসোপরে অর্জুনের মুগ্ধ শির।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে দৃঢ় প্রেম-আলিঙ্গনে
স্থির দুই বীরমূর্তি, ধারা বহে দু-নয়নে।
নির্বাপিত অগ্নিগিরি-শেখর হতে শীতল
যেন নির্ঝরিণীধারা বহিতেছে অবিরল।
"চেয়ে দেখ মা আমার!"—কহে শৈল মুগ্ধমন—
"আর্য-অনার্যের আজি চির-প্রেম-সম্মিলন!
কি শোকের মরুভূমে,—কে লীলা বুঝিবে তাঁর?—
উথলিল সুশীতল কি প্রেমের পারাবার!
পূর্ণ মনোরথ তোর, পূর্ণ মনোরথ মম,—
ধরাতলে ধর্মরাজ্য হইল পূর্ণ স্থাপন!

আনন্দে পূর্ণিত প্রাণ, আয় মা! হৃদয়ে আয়!
দে রে স্থান বুকে তোর এ ভগ্নীকে, বালিকায়!"
মূৰ্ছিতা হইয়া শৈল পড়িলা ভদ্রার বুকে,
মূৰ্ছিতা সুভদ্রা, বসি বুকে-বুকে মুখে-মুখে!
আর্য-অনার্যের বীর্য, আর্য-অনার্যের শক্তি,
আর্য-অনার্যের প্রেম, আর্য-অনার্যের ভক্তি,
আর্য-অনার্যের ধর্ম, কর্ম আর্য-
অনার্যের,
এতদূরে—এইরূপে মিশি মহাভারতের
সঞ্চারিল নবযুগ। নবযুগ-ইতিহাস
এইরূপে, এতদূরে,—মানব-অদৃষ্টাকাশ
করিয়া আলোকপূর্ণ,—খুলিল মহিমান্বিত,
ভারতে মহাভারত হইল পূর্ণ স্থাপিত।
ব্রাহ্মণের ধর্মগ্লানি, ক্ষত্রিয়-অধর্ম আর,
অনার্যের সংঘর্ষণ, কাঁপাবে না ভিত্তি তার।
আর্য-অনার্যের এই মহাশক্তি সম্মিলিত
গঙ্গা-যমুনার মতো, কিছুদূর প্রবাহিত
হইয়া অমিশ্র স্রোতে, হইবে পূর্ণ মিশ্রিত,
করিবে ভারতভূমি শান্তি-বারি-বিপ্লাবিত
সহস্র-সহস্র বর্ষ। সে শান্তি-প্লাবিত-তটে
ফলিবে কতই রত্ন, নীল নৈশাকাশ পটে
অনন্ত, নক্ষত্র-মতো! কত কীর্তি অতুলিত,
অমর, অনন্তস্পর্শী, হবে তাহে প্রতিষ্ঠিত,
অসংখ্য মৈনাক-মতো। মহাকাল-পারাবার
গাইবে সে কীর্তি-গীত, প্রণমিবে অনিবার।"
ভাঙিল আনন্দ-স্বপ্ন, জাগিল হৃদয় চারি,
জিজ্ঞাসিলা ধনঞ্জয় মুছিয়া নয়ন-বারি
আপনার—"নাগরাজ! করো আত্ম-সংবরণ!
কহ দয়া করি, তুমি দেখেছ কি নারায়ণ?
দেখিতে সে পদাম্বুজ বড়ই আকুল প্রাণ।
কোথায় আছেন হরি? দেখেছ কি ভগবান?"
"দেখেছি"—বাসুকি ধীরে উত্তরিলা শান্ত, স্থির,
বহিতে লাগিল পুনঃ দু-নয়নে প্রেম-নীর।
"দেখেছি, কিরীটি! আমি দেখেছি নয়ন ভরি
দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন হরি!
দগ্ধ মরু দেখে যথা নিদাঘের নব-ঘন,
দেখিয়াছি আমি সেই নবরূপী নারায়ণ।

এই শিলাসনে বসি, এই নিম্ববৃক্ষতলা,
অঙ্কে-বক্ষে কারু মম, প্রেমে জড়াইয়া গলা।
বড় পুণ্যবতী কারু! কি প্রেম-মুরতিখানি!
সেই পুণ্য, সেই প্রেম, কোথা পাব পাপী আমি!
মহাশক্র!"—নাগপতি কাঁদিতেছে শিশু-সম—
"যাদব শোণিতে সদ্য কলুষিত কর মম!
তথাপি কি ক্ষমা, দয়া! কহিলেন—'এসো ভাই!
এসো বক্ষে!—লীলা শেষ—শান্তিধামে চল যাই!'
পড়িলাম পদতলে, লইলেন তুলি বক্ষে,
কি প্রেমনয়নে চাহি, কি ধারা বহিছে চক্ষে!
কি ত্রিদিব সেই বক্ষ! মরুবক্ষে কি অমৃত
ঝরিল অজস্র! প্রাণ হইল কি পবিত্রিত,
শীতলিত, কি দ্রাবিত! পাষাণ হইয়া জল
বহিতে লাগিল যেন নেত্রপথে সুশীতল।
হইলাম মূরছিত, দেখিলাম ধরাতল
শত চন্দ্রালোকে যেন হইয়াছে সমুজ্জ্বল।
কি সংগীত, কি সৌরভ, মধুর, মধুরতর,
উঠিল ভাসিয়া ধীরে, মনপ্রাণমুগ্ধকর!
কি সুন্দর পুষ্পরথ! রথ-শিরে সুদর্শন
কিবা চক্র সমুজ্জ্বল! স্তম্ভ-শিরে সুকেতন,
সুদর্শন চক্রাঙ্কিত, উড়িতেছে কি লীলায়!
কি লীলায় উঠিতেছে ধীরে রথ অমরায়!
রথে বসি নারায়ণ, অঙ্কে কারু বসি সুখে
গলা জড়াইয়া প্রেমে, বুকে-বুকে মুখে-মুখে
পরশিয়া ভাবাবেশে; ভাবাবেশে চরাচর
গাইতেছে হরিনাম,—চরাচর কি সুন্দর!
গাইতেছে হরিনাম পারাবার কি মধুর!
গাইতেছে অন্তরীক্ষ, গাইতেছে সুরপুর!
ভাবাবেশে দেবাঙ্গনা নাচিয়া-গাইয়া নাম,
বর্ষিতেছে সুবাসিত পুষ্পরাশি মুগ্ধপ্রাণ।
তরঙ্গে-তরঙ্গে প্রেম, তরঙ্গে-তরঙ্গে নাম,
প্লাবি বিশ্ব ছুটিয়াছে গ্রহে-গ্রহে অবিরাম।
সে প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে, সে নামতরঙ্গে আর,
ভাসিয়া উঠিছে রথ;—বিশ্ব শান্তি-পারাবার!
আমি রহিলাম পড়ি, হায়! মহাপাপী আমি!
যাদবের সদ্য রক্তে কলুষিত মম পাণি!

না-না নাথ! জানো তুমি, তুমি তো অন্তরযামী,
আমি বনপশু হীন, নহি আততায়ী আমি।
প্রকৃতির সে বিপ্লবে, সে নিশীথে বিভীষণ,
যাদব-শিবিরে পশি করেছি সম্মুখ-রণ।
একটিও গুপ্ত শর, একটিও গুপ্তাঘাত,—
আমি করি নাই গুপ্ত একবিন্দু রক্তপাত।
এই দেখ অঙ্গে-অঙ্গে অস্ত্রলেখা বাসুকির!
বাসুকি দুর্বাসা নহে, বাসুকি অনার্য বীর।
তুমি বাসুকিরে নাথ! করিয়াছ আলিঙ্গন
কত দয়া! কত প্রেম! নরহরি! নারায়ণ!"
আরবার বাসুকির হইতেছে নির্নিমেষ।
পুলকিত, রোমাঞ্চিত হইতেছে কলেবর,
হইতেছে স্বেদোদ্‌গম, দু-নয়নে দর-দর
বহিতেছে প্রেমধারা, কি যেন আনন্দ-নীরে
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে।
বাসুকি আবিষ্ট কণ্ঠে কহে—"দেখো কি সুন্দর।
কি সুন্দর বৃন্দাবন! কি কদম্ব মনোহর!
কি জ্যোৎস্না! কি সুন্দরী যমুনা বহিছে হাসি!
কি পুষ্প-সৌরভ! কিবা বাজিছে মধুর বাঁশি।
কি প্রেমমুরতি শিশু, কি প্রেম-নয়নধারা!
গলা জড়াইয়া করি প্রেমময়ী আত্মহারা!
ওই বাজিতেছে বাঁশি কি মধুরে—'আয়! আয়
এই যাই, এই যাই।"—বাসুকি ছুটিয়া যায়
দুইবাহু প্রসারিয়া; মহাভাবে প্রেমভরে
পড়িতে ধরায়, পার্থ ধরিলেন ক্ষিপ্র করে।
রাখিলেন সুভদ্রার অঙ্কে শ্লথমুগ্ধ শির;
বসিলেন শৈল, পার্থ, পদতলে বাসুকির
লয়ে বক্ষে পদতীর্থ। ভাবাবিষ্ট তিনজন
রহিলেন চাহি শূন্যে সেই প্রেম-বৃন্দাবন।
প্রেমাশ্রু নয়নে, প্রেম-আনন্দে চিত্ত অচল
শুনিলেন সেই বাঁশি, সেই যমুনার কল।
সুভদ্রার অঙ্ক-স্বর্গে শুইয়া আনন্দ মনে
মহাভাবে গেলা চলি বাসুকি সে বৃন্দাবনে।
কাঁপিল বসুধা যেন মহাভাবে বিকম্পিত;
গরজিল সিন্ধু যেন মহাভাবে উচ্ছ্বসিত।
ঘোরাল প্রকৃতিমূর্তি; দিনে নাহি দিবাকর;
মহাভাবে সমাধিস্থ যেন বিশ্ব-চরাচর।

আংকেলের পত্র

সাহেব বাচ্চা 'হলে কি মা!
    এমন পাষাণ হতে হয়?
কতদিন গিয়েছিস মা?
    ছেলে কি তোর কেউ নয়?
তোর ক্ষুদ্র বুকখানি ছিল স্নেহে চক্-চক্,
জব্বলপুরে গিয়ে কি মা! হইলি কি পাষাণ রক'?
আমি কাঁদি "মা-মা" বলি;
    তোর মা "খালাস" করে খানা
এসো বেঙ্কো বিবি সেজে খাচ্ছে হাওয়া বিবিয়ানা।
জব্বলপুরের হাওয়া এবার করিবে নালিশ জব্বর,
এত হাওয়া খেলে, তার থাকবে না যে চালের খড়।
গিয়েছিলি কি নর্মদায়, দেখেছিস কি জলধারা?
নীলজলে দেখেছিস কি খেলিতেছে কি ফোয়ারা?
বহিছে নর্মদা যথা মর্মরের মাঝখানে,
বহিবি তেমতি মা গো! সংসার-পাষাণ-প্রাণে?
আমার নির্মলা মা তেমতি শান্ত-শীতলা,
বহিবে ফোয়ারা খেলি স্নেহের সুধা নির্মলা।
নির্মলা নর্মদা-মতো, এই আশীর্বাদ করি,
বহিবি সংসার-শৈলে সুধাময়ী রূপ ধরি।
ছি-ছি জেটি, মিলি মাসি, বাঘের পিসি
    বাঘের মাসি,
তাহাদেরে দিবি আমার আদর মা। একরাশি!
বলিস ভুলেছি ঝগড়া হয়েছি মা ছেলে ভালো,
ধরিয়াছি হেট্-কোট বি এ মহল করবো আলো।
(গুরুমাকে)
গুরুমাকে বলবি তাঁর আড্ডা ইন্টার-মিডিয়েট,
নিত্য দন্ডবৎ করি কালামুণ্ড করি হেট।

সেলাম করি দেখিলে মা পশ্চাতে কুঞ্চিতা শাড়ি।
ভাবি মনে ইনস্ আল্লা! কাজি মোল্লার পাকা দাড়ি।
(তোর) খোঁড়া বাপকে, ক্ষুদে মাকে,
    দিবি স্নেহ সবিশেষ।
এইখানে এ বাঙালি আংকেলের পত্র শেষ।
    ইতি—জব্বলপুরের হাওয়া ভক্ষণ-পর্বের
    আংকেলের পত্র নামক মহাকাব্য।

অন্তিম আশা

না চাহি সমাধি উচ্চ মর্মর গৌরব—
প্রতিকৃতি প্রতিমূর্তি নগর-প্রাসাদে,
কিংবা রাজ-পথ-পার্শ্বে—বায়স বিভব।
দাসত্ব-শৃঙ্খল কণ্ঠে গোরাচাঁদ কাঁধে।
আকুলতা নরহন্তা, পরস্ব-হারক
দুর্বল দলনকারী, পাদুকাবাহক
সবলের, দেশদ্রোহী প্রবঞ্চক
সারমেয়গণ-তরে, বিশ্বাসঘাতক।
মা! তোর সংকীর্ণ কুঞ্জে যথা পিকগণ
ভারতের গাইতেছে অমৃত ধারায়
সুশীতল, বহিতেছে শান্তি-সমীরণ,
তাহার শ্যামল তৃণ নিভৃত কোনায়
দরিদ্র নবীন কবি ক্ষুদ্র স্থান চায়।

বিরহ

১

আমি তারে পাব কেমনে
সে আমার প্রাণে-মরমে
        যে দিকে নিরখি
        তার মুখ দেখি
জল-স্থলে অনিলে-গগনে
দেখি চন্দ্রকরে কুসুম-কাননে।

বাজে তার বাঁশি
গ্রহে-গ্রহে ভাসি
করে প্রাণ উদাসী পশি মরমে
ব্রজবালা রবে কেমনে
নবীন ঘরে রবে কেমনে।

২

তুমি চলে যাবে কি দুঃখ তোমারি
তৃষিত চাতকী রবে পথ চেয়ে
প্রাণ যাবে বিরহে তোমারি।

৩

চলো সখি চলো বনে চলো দেখিগে কুসুমগণে
ফুটিছে জাতি-যূথী কিবা দুলিছে সমীরণে
মৃদুল সমীরে
শীতল শিশিরে
বরষিয়া অশ্রু ধীরে কারে নমিছে মনে-মনে।

৪

তুমি তারে দিও না রে মন
সে তো তোমার হবে না আপন
তুমি ভাব সে তোমার
সে তো মনে ভাবে আর
তার তরে কেন কাঁদ অকারণ।

৫

কি সুখের যামিনী
হাসিছে প্রকৃতি কুসুম-মালিনী
নির্মল আকাশে
শশধর ভাসে
হাসেন হরি রাসে হাসে অবনী
হাসে গোপিনী।

৬

দিবানিশি মন উদাসী ভাবি যাহারে,
সে তো কভু মনে নাহি করে আমারে।
তারি তরে কাঁদিছে প্রাণ সে তো চাহে না আমারে
তবু কেন পোড়া মন চাহে তাহারে।

তিনখানি ছবি

১

"মরি কি সুন্দর! দ্বিতীয়ার শশী
সোনার পুতলি শিশুটি ওই!
হেলিয়া-দুলিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া;
কোথায় বসন? ভূষণ কই?
হেম-হিমাদ্রির কাঞ্চন-শৃঙ্গেতে
সোনার উদ্যানে সুবর্ণালয়;
শিশুটি বেড়ায় কাঙালের মতো;
সে যেন উহার কিছুই নয়।
ধন-অভিমান নাহি শিশু-মুখে,
ধন-আভরণ অঙ্গেতে নাই।
পাগলের মতো যাইছে চলিয়া
কি যেন ভাবিছে, কি যেন চাই।
আপনা-আপনি কহিতেছে কথা,
আপনার মনে আপনি হাসে।
সরলতা-মাখা সে ক্ষুদ্র মু-খানি
সরলতা ক্ষুদ্র অধরে ভাসে।
হৃদয়টি ক্ষুদ্র দয়ার নির্ঝর
পর-দুঃখে ক্ষুদ্র ধারায় বয়।
ফুটিছে অস্ফুট কি উচ্চ-উচ্ছ্বাস,
শিশুটি যেন বা ধরার নয়।
বসি অন্তরীক্ষে কহে ভাগ্য-দেবী,
এতই প্রসাদ করিনু দান,
নাহি অভিমান, রহিলি উদাস,
"কত উচ্চ তোর দেখিব প্রাণ!"

২

নীল সিন্ধু-নীরে শ্বেতদ্বীপ-তীরে
বসিয়া যুবক কে?
আশার অঙ্কেতে হইয়া শায়িত
কি স্বপ্ন দেখিছে সে?
হৈম হিমালয়-শৃঙ্গে, হৈম অট্টালিকা-অঙ্কে
সুখের মুরতি যুবা বসি।

প্রথম যৌবনোচ্ছ্বাসে কি গৌরব পরকাশে!
আজি শিশু অষ্টমীর শশী।
দেখিতেছে ভবিষ্যৎ— যেন স্বচ্ছ ছায়াপথ—
কীর্তির তারকা-ঝলসিত,
যশের সৌরভ-রাশি আকাশে যাইছে ভাসি
পুণ্য সমীরণে প্রবাহিত।
পাগল শিশুটি আজি হইয়াছে শান্ত-স্থির,
পবিত্র হৃদয়-নির্ঝরিণী
হইয়াছে মাতোয়ারা জগতের দুঃখরাশি
জুড়াইতে, সন্তাপকারিণী।
কি বিরাট শব্দ ওই! হইল কি বজ্রাঘাত
অকস্মাৎ? যুবা চমকিল,—
সেই সম্পদের শৃঙ্গ, সেই স্বর্ণ-অট্টালিকা
বিচূর্ণিত, আকাশ ছাইল!
গগন হইতে যুবা পড়িল ভূতলে যেন,
সম্মুখে বিপদ-পারাবার,—
নাহি অন্ত, নাহি কূল, কি তরঙ্গ সমাকুল!
সে পুরীর চিহ্ন নাহি আর!
ভাগ্যদেবী শূন্যে বসি, কহে খল-খল হাসি—
"এখন কেমন, বাছা মোর!
"পড়িল না এ ঐশ্বর্যে একটি কলঙ্করেখা?
"সে উচ্চ হৃদয় কোথা তোর?
"কোথায়?"—নির্ভয়ে যুবা কহে বক্ষ দেখাইয়া—
"পাষাণি রে! দেখ সে হৃদয়।
"ঢাল্ ঝড় বজ্র তোর, উচ্চ পুণ্যপথ হতে
"এ হৃদয় টলিবার নয়।
"ওই স্বর্ণরাজ্য, পুরী পিতার সৃজন মম,
"আমি সেই পিতার সন্তান;
"তাঁর পুণ্য-পদ-ছায়া হৃদয়ে করিয়া ধ্যান,
"কটাক্ষেতে করিব নির্মাণ।
"স্বর্ণ-পুরী শ্রেষ্ঠতর, পুণ্যেতে পবিত্র ভিত্তি
"স্থাপন করিয়া দৃঢ়তর—
"ধর্মচূড়া সুদর্শন করিবে স্বর্গ-চুম্বন
"নীল নভে যেন শশধর।
"পবিত্র ছায়ায় তার তাপিত পাইবে শান্তি,
"তৃষাতুর—নীর সুশীতল;

"স্বদেশের-স্বধর্মের সেই চূড়া সুদর্শন
"হবে অবলম্বন প্রবল।
"বিদীর্ণ বোমের মতো দেখিব কেমনে তুই
"উড়াইবি সে পুরী আমার।
"দিনু ঝাঁপ,—নাহি ভয়; বুকে উচ্চ আশা, শিরে
"বিপদ-ভঞ্জন হরি যার।"

৩

সিন্ধু-পূর্ব-তীরে স্বর্ণ-শেখর-মালায়
কিবা পূর্ণচন্দ্র আজি, মরি!! শোভা পায়!
ক্রমে দ্বিতীয়ার শশী, চন্দ্র অষ্টমীর,
পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত! নীল-সিন্ধু-নীর
কি আনন্দে প্রতিবিম্ব করিয়া ধারণ,
তরঙ্গে-তরঙ্গে তাহা করিছে চুম্বন।
পর-দুঃখ-কাতরতা হৃদয়ে তাহার
চন্দ্রের কলঙ্ক-মতো শোভার আধার।
দয়ার কৌমুদিরাশি অজস্র ঝরিয়া
তৃষিত-তাপিত প্রাণ যায় জুড়াইয়া।
পদে সম্পদের রাশি শৈলমালা-মতো
চরণে ঠেলিয়া হতেছে উন্নত।
সরলতা—উচ্চতায়, স্নেহে সুশীতল,
হৃদয় দয়ার উৎস পূর্ণ ঢল-ঢল।
অঙ্কে মুক্তকেশী ওই রোহিণী বসিয়া,
মুক্তকেশ-রাশি চন্দ্র-বক্ষে আঁধারিয়া।
শিশুর জীবনাভাস, যৌবন-স্বপন,
বিপদের সে প্রতিজ্ঞা—হয়েছে পূরণ।
কহে ভাগ্যদেবী, মুখে প্রীতি-সমুজ্জ্বল—
"কে বলে বীরত্ব নর-হত্যায় কেবল?
"উত্তাল বিপদার্ণব করিয়া লঙ্ঘন
"যে যায় সুখের পার—বীর সেইজন।
"পশুত্ব, দেবত্ব,—দুই সম্পদের ফল।
"ধরাতলে পশুত্বই দেখিবে কেবল।
"যে পারে দলিতে পদে পশুত্ব এমন,
"বৎস! সে প্রকৃত ধনী, দেবতা সে-জন।"

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি (২৯ মাঘ ১২৫৩) চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে নবীনচন্দ্রের জন্ম। পিতা বৈদ্য-বংশজাত গোপীমোহন রায়। মাতা রাজরাজেশ্বরী দেবী।

শৈশব : নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনী'-গ্রন্থে সবিস্তারে নিজের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। শৈশবে নানাধরনের দুষ্টুমি ও সাহসিকতার (তাঁর নিজের ভাষায় : তাঁর 'জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিত হইতে পারিত') পরিচয় দিয়েছেন। শৈশবেই কবিত্বশক্তির উন্মেষ হয়। সৌন্দর্যবোধ ও রূপমুগ্ধতা তাঁর সহজাত।

শিক্ষা : পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি; কিছুদিন স্থানীয় পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভ। আট বছর বয়সে তিনি পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রাম শহরে আসেন এবং সেখানে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে (সেকেন্ড গ্রেড স্কলারশিপ-সহ) উত্তীর্ণ হন। পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। এফ.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন (১৮৬৫)। এই সময়ে কিছু পারিবারিক অশান্তির জন্য পড়াশোনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিবাহ : উনিশ বছর বয়সে এফ.এ. পরীক্ষা দেওয়ার অনতিপরে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কর্মজীবন : বি.এ. পরীক্ষার যখন তিনমাস বাকি, তখন নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। পারিবারিক সমস্যা ও প্রবল আর্থিক দুশ্চিন্তা-অনিশ্চয়তার মধ্যে চাকরির জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন। হেয়ার স্কুলে একমাস শিক্ষকতা করেন। তারপর প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন (২৪ জুলাই ১৮৬৮)। ১৯০৪ সালে জুলাই মাসে অবসরগ্রহণের এক বছর আগে চাকরিতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। চাকরিজীবনে তাঁকে যশোহর, চট্টগ্রাম, পুরী,

ফরিদপুর, পাটনা, ভাগলপুর, নোয়াখালি-ফেণী, নদীয়া-রাণাঘাট, ডায়মন্ডহারবার, আলিপুর, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা—বিভিন্ন স্থানে কাজ করতে হয়।

গ্রন্থ — 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮)। 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫)। 'ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭)। 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। 'রৈবতক' (১৮৮৭)। 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী' (১৮৮৯)। 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' (১৮৮৯)। 'খৃষ্ট' (১৮৯১)। 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২)। 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩)। 'অমিতাভ' (১৮৯৫)। 'প্রভাস' (১৮৯৬)। 'শুভ-নির্মাল্য' (১৯০০)। 'ভানুমতী' (১৯০০)। 'আমার জীবন' (পাঁচ খন্ড ১৯০৮-১৯১৩)। 'অমৃতাভ' (১৯০৯)।

মৃত্যু — ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১৩১৫) নবীনচন্দ্রের মৃত্যু হয়।